সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

শান্তির পথযাত্রায় সেবাযত্নের সংস্কৃতি

পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও আমাদের সংস্কৃতি

পজিটিভ প্যারেন্টিং

ইতিহাসের জীবন্ত রূপরেখা : 'বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচিতি'

ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

সাধু ব্রাদার আন্দ্রে বেসেট
প্রথম ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজের আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান-২০২০

তোমার ইচ্ছা পূরণ করাই আমার পরম সুখ

গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের জন্য ছিল খুবই আনন্দের দিন। এ দিনে পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ সমাজের দুইজন ভ্রাতা: **ব্রাদার অর্পণ ব্রেইস পিউরীফিকেশন, সিএসসি** এবং **ব্রাদার সৈকত সিরিয়ান লিঙ্গুয়ার, সিএসসি** আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ব্রাদার অর্পণ ব্রেইজ পিউরীফিকেশন সিএসসি, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের, সেন্ট জেভিয়ার ধর্মপল্লীর, ভবানীপুর গ্রামের মি: ফটু পিউরীফিকেশন ও মিসেস সুমতী গ্রেগরী'র কনিষ্ঠ সন্তান ও ব্রাদার সৈকত সিরিয়ান লিঙ্গুয়ার সিএসসি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের, যীশুর পবিত্র হৃদয় ধর্মপল্লীর (সুইহারী মিশন) উত্তর গোসাইপুর গ্রামের মি: গ্রেগরী লিঙ্গুয়ার ও মিসেস: গোলাপী মিনজ এর সন্তান। আজীবন সন্ন্যাসব্রতকে কেন্দ্র করে তার আগের দিন ৩০ ডিসেম্বর, রোজ বুধবার আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য ধর্মপল্লীতে আরাধনা অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় ব্রাদার অর্পণ ব্রেইজ পিউরীফিকেশন এর নিজ বাড়িতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সংস্কৃতি অনুসারে মঙ্গলানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পরের দিন ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে মহা-খ্রিস্টযাগ অর্পিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ডিডি। বিশপ মহোদয় তার উপদেশে আজীবন সন্ন্যাসব্রতগ্রহণকারী ব্রাদারদেরকে তার শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশপ মহোদয় বলেন, "বর্তমান বাস্তবতায় অনেক যুবক-যুবতী পিছুমুখী হচ্ছেন কিন্তু আজ দু'জন যুবক নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিচ্ছে। তারা আজ মণ্ডলীর কাছে মা মারীয়ার ন্যায় 'হ্যাঁ' বলছে। তারা ঈশ্বরের জনগণকে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করবে। সন্ন্যাসব্রতী জীবনে তিনটি ব্রত আছে: কৌমার্য, দারিদ্রতা ও বাধ্যতা। এই তিনটি ব্রত আমরা এক দিনের জন্য গ্রহণ করিনা বরং আজীবনের জন্য।" একই সাথে তিনি জনগণকে আহ্বান করেন, তারা যেন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদেরকে সাহায্য করে। এ মহাখ্রিস্টযাগে ২৫ জন ফাদার, ৩৫ জন ব্রাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টযাগের পরপরই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ব্রাদার সুবল রোজারিও সিএসসি, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এ অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও স্বার্থক করার জন্য।

একটি আমন্ত্রণ

মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন। তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

সপ্তম থেকে দশম এবং একাদশ, দ্বাদশ, ডিগ্রী ও মাস্টারস্ পর্যায়ে কাথলিক ছাত্ররা ব্রাদার হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে থাকলে নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

আহ্বান পরিচালক পবিত্র ক্রুশ আবাসগৃহ ৯৭, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ মোবাইল : ০১৬০৪৫৩১৬৩৪, ০১৭৭৫০১২২১৪	পরিচালক পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার্স ১৬ মুন্সি হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৮৭২৪১৬৭২৯, (০২) ৪৭১১৩৮৮৯	পরিচালক পবিত্র ক্রুশ বিদ্যাপীঠ গ্রাম ও ডাকঘর: নাগরী, গাজীপুর-১৭৫৩ মোবাইল: ০১৮৫১২৮০৯৫০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০২
■■■■■ ২৪ - ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১০ - ১৬ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শান্তি আনয়নে পারস্পরিক যত্নশীলতা

আমরা সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আর তাই বিশ্ব বা দেশের কোন স্থানে যুদ্ধ, মারামারি বা হানাহানির ঘটনা ঘটলে আমরা কষ্ট পাই। প্রত্যাশা করি সংশ্লিষ্ট মানুষের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় যেন শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের মনের মধ্যে শান্তির স্বপক্ষে এই চেতনা সহায়তা করবে শান্তি আনয়নে কার্যকর ভূমিকা নিতে। মানুষের মনের এই শান্তিবোধকে কার্যকরী পদক্ষেপে পরিণত করার উৎসাহ যোগাতে নববর্ষের দিনেই পালিত হয় শান্তি দিবস। ৫৪তম শান্তি দিবসে পোপ ফ্রান্সিস জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষকে আহ্বান করছেন - শান্তির পথযাত্রায় সেবা-যত্নের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। পোপ ফ্রান্সিস শান্তির জন্য সেবা-যত্নের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন শান্তি দিবসের বাণীতে। বিগত বছরে, মানবজাতির চলার পথে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ আমাদের শিখিয়েছে একটি ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজ গড়ে তুলতে পরস্পরের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রচেষ্টা কতটা বেশি প্রয়োজন। যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি এই সময়ে সমাজে বিরাজমান উদাসীনতা ও অপচয়ের সংস্কৃতিকে মোকাবেলা করতে পারে। কেননা যত্নদানের অর্থই হলো পরিশ্রম সহকারে মঙ্গল করতে চেষ্টা করা। ভালোবাসার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে যত্নদানের মধ্যদিয়ে। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যাওয়া এবং সমস্যা উত্তরণে সহায়তা করা যত্নদানের একটি বৈশিষ্ট্য।

শুধু মানুষই অন্যের যত্ন নেয় তা নয়। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও সকল সৃষ্টির যত্ন নেন। ঈশ্বরের যত্নশীলতার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির মধ্যদিয়ে। তবে সেবা-যত্নদানের উৎস ঈশ্বর এবং আদর্শ যিশু। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর শুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি। এই সৃষ্টির যত্নদানে তিনি সচেষ্ট। মানুষকে আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করে ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দেন যেন সে সৃষ্টির যত্নদান করে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে অনিষ্ট করলেও সৃষ্টিকর্তা সবসময়ই ক্ষমাদানের মধ্যদিয়ে তার যত্নশীলতার প্রকাশ ঘটান। মানুষ যেন ঈশ্বরের যত্নশীলতা আরো কাছে থেকে বুঝতে পারে তাই তিনি যিশুকে এ জগতে পাঠালেন। যিশু দীন-দুঃখীদের পাশে থেকে, রোগি ও মন্দ আত্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করে এবং পাপীদের স্পর্শ ও ক্ষমা করে যত্নশীলতার প্রকাশ ঘটান। শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে ও নিজের দেহ-রক্তকে খাদ্যরূপে দান করে যিশু যত্নশীলতার আদর্শ দান করেন। যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেন, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করেছি তোমরাও তাই করো। এমনিভাবে যিশু শিষ্যদেরকে পরস্পরের ও অন্যান্যদের যত্ন নেবার আহ্বান রাখেন।

আদি মণ্ডলীতে যিশুর ভালবাসাময় যত্নের আহ্বান মনোযোগের সাথেই পালন করা হয়ে আসছিল। ভালবাসার উপর ভিত্তি করেই আদি মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দয়ার কার্যক্রম চর্চা করা হতো। তারা তাদের সমাজকে একটি স্বাগত আবাস হিসেবে গড়ে তুলেছিল। দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটানো, মৃতদের সৎকার, অনাথ ও প্রবীণদের যত্নদান তাদের জন্য একটি প্রচলিত নিয়মই হয়ে উঠেছিলো। পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে যত্নদানে বদান্যতার অভাব দেখা দিলে মণ্ডলীর পিতৃগণ জোর দিয়ে বলতে থাকেন, সম্পদ ও সম্পত্তি হচ্ছে সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে। যত্নদানের মাধ্যমে গণমঙ্গল আনয়ন করাটা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কিছু মানুষ কাজ করছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি নয়। কোভিড-১৯ চলাকালে বিশ্ব অভিজ্ঞতা করেছে ভোগে নিমগ্ন থেকে এবং সবকিছু পেয়েও একাকী আমরা কেউ শান্তিতে থাকতে পারি না। শান্তির জন্য আমাদের পরস্পরের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। সকলে ভাল না থাকলে শান্তি আসবে না সমাজে। তাই বিশ্ববিবেক পোপ ফ্রান্সিস সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষকে আহ্বান করছেন যেন তারা সেবা-যত্নদানের কাজে আরো বেশি নিয়োজিত হন এবং তা চলমান রাখেন। সেবা-যত্নদানের বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রাখার মধ্যদিয়েই তা এক সময় যত্নদানের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে পরিণত হবে।

যত্নদানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পরিবারে। এই পরিবারেই শুরু হতে পারে কীভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই বসবাস করতে পারে। পরিবারকে অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেখভাল করতে হবে। পরিবার ছাড়াও স্কুল-কলেজে অনুশীলন করতে হবে। এই ব্যাপারে গণমাধ্যমকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে যেন প্রতিটি মানুষের মর্যাদা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করতে পারে। ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতাগণ ও তাদের অনুসারিরা বৃহত্তর পরিসরে মূল্যবোধ, সমাজের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অভাবী ভাই-বোনদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার মূল্যবোধ দান করবে। সরকারের সেবা প্রতিষ্ঠান, সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা যেখানে কর্মরত রয়েছেন, তারা বিভিন্ন উপায়ে যত্নদানের সংস্কৃতি সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। এমনিভাবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে একদিন যত্নদানের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যার পথ ধরে জগতে শান্তি আসবে॥ ✝

যিশু বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে, মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর' -মার্ক ১:১৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

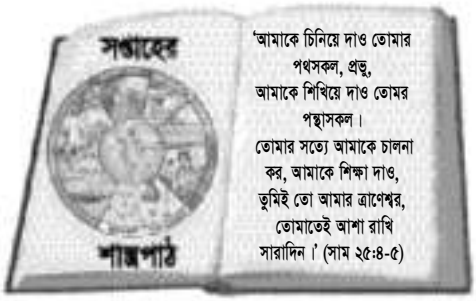

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৪ - ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৪ জানুয়ারি, রবিবার
যোনা ৩: ১-৫, ১০, সাম ২৫: ৪-৭, ৮-৯, ১ করি ৭: ২৯-৩০, মার্ক ১: ১৪-২০

২৫ জানুয়ারি, সোমবার
সাধু পলের মন পরিবর্তন-এর পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
শিষ্যচরিত ২২: ৩-১৬; অথবা ৯: ১-২২, সাম ১১৭: ১-২, মার্ক ১৬: ১৫-১৮

২৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ-এর স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
২ তিমথি ১: ১-৮; অথবা তীত ১: ১-৫, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ২২: ২৪-৩০

২৭ জানুয়ারি, বুধবার
হিব্রু ১০: ১১-১৮, সাম ১১০: ১-৪, মার্ক , ৪: ১-২০
বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

২৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু টমাস, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস
হিব্রু ১০: ১৯-২৫, সাম ২৪: ১-৪খ, ৫-৬, মার্ক ৪: ২১-২৫
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রজ্ঞা ৭: ৭-১০, ১৫-১৬, সাম ৩৭: ৩-৬, ৩০-৩১, মথি ১৩: ৫২

২৯ জানুয়ারি, শুক্রবার
হিব্রু ১০: ৩২-৩৯, সাম ৩৭: ৩-৬, ২৩-২৪, ৩৯-৪০, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

৩০ জানুয়ারি, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
হিব্রু ১১: ১-২, ৮-১৯, সাম লূক ১: ৬৯-৭৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৪ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৭৬ সিস্টার এডেলট্রুড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফাদার রিনাল্ডো বের্নাক্কী এসএক্স (খুলনা)

২৫ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৮৭২ ফাদার লুইস মারী লুসিয়া সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার লুসিয়ান গোপিল সিএসসি(চট্টগ্রাম)
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল এসএমআরএ

২৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯০৬ মাদার মেরী অব দ্যা ক্রস পিসিপিএ
+ ১৯২০ সিস্টার ফিন্টান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৭ মন্সিনিওর জর্জ ব্রিন সিএসসি

২৭ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯১৪ সিস্টার এম. এউলালি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৮ ফাদার এমিলিও পিগোনি পিমে
+ ১৯৯৪ সিস্টার কানন ফোরেন্স গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সিস্টার বাসন্তী রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৫ সিস্টার এম. স্কলাষ্টিকা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী জেভিয়ার এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রাদার ব্রুনো দ্রি, এসএক্স (খুলনা)

৩০ শনিবার
+ ১৯২৪ ফাদার আলবের্তো কাজ্জানিগা পিমে
+ ১৯৯৮ ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড সিএসসি

আসুন মাস্ক পড়ি

মাস্ক পরিধান করেই বর্তমান সময়ে মরণঘাতী নিষ্ঠুর করোনাভাইরাস হতে আমরা নিজেকে এবং অন্যকেও সুরক্ষা করতে পারি। ইউরোপ ও আমেরিকায় শীতের শুরু হতেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে এবং পুনরায় নিত্যদিন করোনা সংক্রমন ও মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে। আর আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশে শীতের শুরুর আগেই গত প্রায় বিশ দিন যাবৎ করোনার সংক্রমনের হার প্রতিদিন ঊর্ধ্বমুখী এবং করোনার মরণ ছোবলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর হার। করোনার শুরু হতেই চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ বলে আসছেন, একমাত্র যথার্থ নিয়মে মাস্ক পরিধানের মাধ্যমেই করোনা সংক্রমন হতে রক্ষা পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা দুই জনের মধ্যে যদি দুইজন মাস্ক পড়ি তাহলে করোনা সংক্রমন হবে না শতকরা ৮৫% আবার একজন মাস্ক পড়লে এবং অন্যজন না পড়লে শতকরা ৬৫% সংক্রমন হতে রক্ষা পাওয়া যাওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা কতজন মাস্ক পড়াকে গুরুত্ব দেই?

ইদানিং খুবই পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শীতের আগমনের সাথে করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকলেও আমি-আপনি আমরা এখনও মাস্ক পড়ার ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ও সরকার নির্দেশ জারী করেছেন, প্রত্যেকের মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক কথার অর্থ হলো, যে আদেশ সরকার করেছেন তা আমার, আপনার ও আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন ব্যাপার নয় আমাদের মানতেই হবে এবং বাসার বাহিরে বের হলেই বাধ্যতামূলক মাস্ক পড়তেই হবে। ইতিমধ্যে বলা হয়েছে সকল-স্থানে কার্যকরী হবে 'No Mask No Service' অর্থাৎ 'মাস্ক নেই, সেবা নেই'। শহরের প্রাণকেন্দ্রসহ অলিগলিতে ভ্রম্যমান আদালত যারা মাস্কবিহীন তাদের ধরে আর্থিক জরিমানা শুরু করলেও আমরা বেশির ভাগই মাস্কবিহীন প্রচণ্ড মাস্ক ঝুঁকি নিয়ে মাস্ককে একদম পাত্তা না দিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর গ্রামেগঞ্জে তো মাস্ক পড়ার কোন বালাই নেই। এতে করে বর্তমান করোনার পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছি এবং প্রচণ্ড স্বাস্থ্যঝুঁকিতে বসবাস করছি। আমাদের সবার মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের চারপাশে করোনার নিষ্ঠুর ছোবল ঘিরে ধরেছে। তাই সতর্ক ও সচেতন হতেই হবে। আমরা কোন দিন করোনার ভ্যাকসিন পাবো তা কেউ জানি না। বিশ্বের ধনী দেশগুলো তাদের দেশের নাগরিকদের বিনামূল্যে সবাইকে ভ্যাকসিন দিবে কিন্তু আমাদের সেই সামর্থ এখনোও হয়নি। তাই করোনার মরণ আঘাত হতে বাঁচতে স্বাস্থ্যবিধি আমাদের অবশ্যই মানা একান্ত প্রয়োজন। আর স্বাস্থ্যবিধি মানার বড় উপায় প্রতিনিয়ত মাস্ক পড়া। মাস্ক গলায় ঝুলানো নয়, মাস্ক যথার্থ নিয়মে মুখ, নাক সম্পূর্ণ ঢেকে পড়তে হবে। কোন কারণে মাস্ক খুলতে হলে ডান বা বামের এক সাইড হতে খুলতে হবে ও পুনরায় পড়তে হবে তাহলে নাকে মুখে ভাইরাস প্রবেশ করতে পারবে না। মাস্ক পড়ার ব্যাপারে সরকারের প্রশাসনকে আরো শক্ত, কঠিন, ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এখন সময়ের বড় দাবী। প্রয়োজনে বর্তমানের জরিমানার পরিমান দশগুণ করা হোক।

মানুষের জীবন আগে। আসুন নিজ জীবনকে ভালবাসি এবং নিজ জীবন ও অন্যের জীবন প্রাণঘাতী করোনা হতে রক্ষার্থে বর্তমান বিশ্বের এই দুর্যোগ মুহূর্তে প্রথমে নিজে সচেতন হয়ে মাস্ক পড়ি, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সমাজের শিশু হতে শুরু করে আবাল বৃদ্ধবনিতা সবাইকে মাস্ক পড়তে সচেতন ও উৎসাহিত করে করোনা সংক্রমন হতে সম্মিলিতভাবে নিজেদের সুরক্ষা করি। করোনা হতে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করতেই হবে, মাস্ক পড়ার অন্য কোন বিকল্প নেই।

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

সাধারণকালের তৃতীয় রবিবার (খ পূজনবর্ষ)
প্রথম পাঠ : যোনা ৩: ১-৫,১০
২য় পাঠ : ১ম করিন্থিয় ৭:২৯ -৩১
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১:১৪-২০

আজকের ১ম পাঠে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রবক্তা যোনাকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তিনি নিনিভিতে যান এবং তাদের কাছে মন পরিবর্তনের কথা প্রচার করেন। নিনিভিবাসী বিভিন্নভাবে পাপময় জীবন-যাপন করছিল। আর তাই ঈশ্বর তাদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন। তবে তাদের তিনি সুযোগ দিলেন মন পরিবর্তন করার। আর তাই প্রবক্তা যোনাকে পাঠানো হয়েছিল যেন তারা পাপ থেকে মন পরিবর্তন করেন। তারা যোনার কথা বিশ্বাস করে ধনী-দরিদ্র মানুষ সবাই উপবাস করে, চটের কাপড় পড়ে মন পরিবর্তন করেছিল যার ফলে ভগবান যে অমঙ্গল ডেকে আনবেন বলে স্থির করেছিলেন তা আর আনলেন না।

ঈশ্বরের চোখে আমরা সবাই পাপী ও দুর্বল আর ঈশ্বর আমাদের সুযোগ দেন আমরা যেন পাপের পথ ত্যাগ করে তার পথে ফিরে আসি। যখন ঈশ্বরের পথে ফিরে আসি তখন ঈশ্বরের দয়া, ভালোবাসা আমাদের জীবনে অনুভব করি। লেখক হেলেনকিলার বলেছেন, "পৃথিবীতে সেই সবচেয়ে ভালো যে মনে করে আমি ভালো না, আর সেই সবচেয়ে খারাপ যে মনে করে আমি সবচেয়ে ভালো।" আর মাদার তেরেজা বলেছেন, "তুমি যদি কাউকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাও তবে তার খারাপ দিকগুলো তুমি দেখবে না কিন্তু প্রথমেই যদি তার দিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে তাকাও তবে তাকে ভালোবাসতে ভুলে যাবে।" তাই আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আমরা সবাই পাপী হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের কাছে যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাই তখন নিনিভিবাসীর মতো তাঁর দয়া ও ক্ষমা আমাদের জীবনে লাভ করি।

২য় পাঠ করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্রে আমরা দেখতে পাই সময়ের সাথে মানব জাতির জীবনের সম্পর্কের কথা। বিবাহিত যারা, আনন্দিত যারা, শোকার্ত যারা তাদের মনোভাব যেন এমন হয় তাদের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। কারণ সবাইকে একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে মৃত্যুর পর মিলিত হতে হবে। মানুষের বর্তমান জীবনটা একদিন লোপ পাবে কারণ মৃত্যুর পর মানুষের রূপান্তিরিত জীবন হবে।

মঙ্গলসমাচারে যিশু সকলের কাছে ঐশরাজ্য ও মনপরিবর্তনের কথা প্রচার করছেন। তিনি বলছেন, স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই স্বর্গরাজ্য আর তিনি নিজে তাদের কাছে আছেন কিন্তু তবুও লোকেরা তাকে চিনতে পারছে না। অন্যদিকে যিশু শিমোন, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহনকে তাঁর কাজের জন্য আহ্বান করেছেন। আর যখনই তাদের ডাকলেন তারা সঙ্গে-সঙ্গে তাদের নৌকা, জাল ও তাদের পরিবার রেখে যিশুর সঙ্গে চললেন। যিশু কেন তাদের কেন এই সাধারণ জেলেদের আহ্বান করলেন? এর কয়েকটি কারণ আমি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি।

১। ঈশ্বরের কাজের জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত ছিল। যিশু যখন তাদের ডাকলেন তারা সঙ্গে-সঙ্গে যিশুর আহ্বানে সাড়া দিলেন। তারা চিন্তা করেনি তাদের মাছ ধরার জাল ও নৌকার কি হবে বরং সব কিছু ফেলে রেখে তারা যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আমাদের জীবনে যখন ঈশ্বর ডাকেন আমরাও যেন সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে তার ডাকে সাড়া দিই। আমাদের সেই ডাক হতে পারে মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্য, গির্জায় যোগদানের জন্য কিংবা অন্যান্য সেবা কাজের জন্য।

২। জেলে শিষ্যেরা অত্যন্ত সহজ-সরল ও নম্র স্বভাবের। অষ্টকল্যাণ বাণী বলা হয়েছে, অন্তরে যারা দীন ধন্য তারা। তাই সহজ-সরল ও নম্র স্বভাবের মানুষে ঈশ্বরের বেশি প্রীতিভাজন। আমরাও যেন আমাদের জীবনে জটিলতা-কুটিলতা ত্যাগ করে শিষ্যদের মতো সহজ-সরল ও নম্র স্বভাবের মানুষ হতে পারি।

৩। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। যারা নদীতে বা সাগরে মাছ ধরে তাদের জীবন বাজি রেখে মাছ ধরতে যায়। ঝড়, বাতাস, ঢেউ, রাত কিংবা পানিতে ডুবে মরে যাওয়া কোনটাই তাদের মাছ ধরা থামিয়ে রাখতে পারে না। তাই শিষ্যেরা যিশুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মাঝেও বাণীপ্রচার করেছেন।

৪। জেলে শিষ্যেরা সাহসী ও আত্মত্যাগী। তারা খুব সামান্য কাপড় পরিধান করেন যার ফলে প্রেরণকর্মে আত্মনিবেদন করতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আমরাও যেন আমাদের পরিবারে ও সমাজে যিশুর কথা বলতে শিষ্যদের মতো সাহসী ও আত্মত্যাগী হই।

৫। শিষ্যেরা অল্পতেই সন্তুষ্ট। তাদের জাগতিক চাহিদা বা জাগতিক সম্পদের প্রতি লোভ নেই। আমরাও যেন জাগতিক ভোগ-বিলাসীতার দিকে মনোযোগ না দিয়ে ঈশ্বর আমদের যেইটুকু দিয়েছেন তাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকি এবং ঈশ্বরের কাজের জন্য আমাদের যা আছে তা দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করি।

৬। শিষ্যেরা অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী। মাছ ধরার সময় একবার মাছ না পেলে তারা বার বার চেষ্টা করে ও পরিশ্রম করে।

৭। যিশু জেলে শিষ্যদের মর্যাদা দিলেন। যিশুর কাছে সবাই সমান। জেলেদের যিশুর কাজের জন্য আহ্বান করে তিনি তাদের মানবিক মর্যাদা দিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাদের দায়িত্ব দিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, যিশু আমাদেরও প্রতিনিয়ত আহ্বান করছেন। আমরা যেন ব্যক্তিভাবে যিশুর সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই এই যিশু আমাকে দিয়ে কি সেবা কাজ করাতে চান আমরা যেন তা করি। আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। আর সেই সেবা কাজ যেন ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য করতে পারি॥

৫৪তম বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

শান্তির পথযাত্রায় 'সেবা-যত্নের সংস্কৃতি'

১) নববর্ষের প্রারম্ভে সকল সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নেতৃবৃন্দ, আধ্যাত্মিক নেতা ও বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ এবং সদিচ্ছাপূর্ণ সকল নারী-পুরুষ সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে কোভিড-১৯ মহামারীতে ব্যাপক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটে যা পরবর্তীতে ধীরে-ধীরে বৈশ্বিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা দেয়। এই বিপর্যয় রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যাসমূহ যেমন, জলবায়ু, খাদ্য, অর্থনীতি অভিবাস এর মত সমস্যাসমূহকে আরো গভীর বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমার দুঃচিন্তা বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা তাদের আপনজন বা চাকুরী হারিয়েছে। আমি উদ্বিগ্ন ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট, গবেষক, স্বেচ্ছাসেবক, পুরোহিত, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবায় কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য। তাদের প্রত্যেকে ইতোমধ্যে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করেছে এবং এখনও করছে যারা অসুস্থ তাদের নিরাময়ের জন্যে বা তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এমনকি অনেককে এই মহৎ কাজে সেবা দিতে দিতে তাদের নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে হয়েছে। তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ রাখতে চাই, তারা যেন সমাজের দরিদ্র ও সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠিকে কোভিড-১৯ এর টিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত না করেন। অনেকে এই ক্ষেত্রে তাদের ভালোবাসা ও ভ্রাতৃবন্ধনের সাক্ষ্য বহন করার পরেও এটি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভালবাসা ও একাত্মতার এতসব সাক্ষ্যের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করেছি, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ ও ভিন্ন জাতের বা ধর্মের প্রতি ঘৃণা এবং যুদ্ধ ও ব্যাপক সংঘর্ষ; যা কেবল মৃত্যু ও ধ্বংসই ডেকে আনে। বিগত বছরে, মানবজাতির চলার পথে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ আমাদের শিখিয়েছে একটি ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজ গড়ে তুলতে এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রচেষ্টা কত প্রয়োজন। সে কারণে আমি আমার এ বছরের বাণীর শিরোনাম করেছি, "শান্তির পথযাত্রায় সেবা যত্নের সংস্কৃতি"। যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি এই সময়ে সমাজে বিরাজমান উদাসীনতা, অপচয় সংস্কৃতিকে মোকাবেলা করে।

২) সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যত্নবান হওয়ার জন্য আমাদের মানবীয় আহ্বানের উৎস

অনেক ধর্মীয় মতবাদেই মানবজাতির গোড়ার ইতিহাস, সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি এবং একজন মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেয়া আছে। পবিত্র বাইবেলের আদি পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মানুষের জন্য সুরক্ষার কথা বলা আছে। এখানে মানুষ ও পৃথিবীর এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। সৃষ্টি সম্পর্কিত পবিত্র বাইবেলের ব্যাখা অনুযায়ী, ঈশ্বরের পূর্ণ আস্থা ছিল আদমের ওপর। এদেনে প্রোথিত বাগানে ভূমিকর্ষণ ও তা রক্ষার ব্যবস্থাপনা পৃথিবীকে শুধু ফলশালীই করবে না সে সঙ্গে জীবনকে সহায়তা দানে পৃথিবীকে রক্ষা করবে ও সংরক্ষণ করবে। 'কর্ষণ' ও "রক্ষণ" কাজসমূহ আদমের সঙ্গে তার বাগানবাড়ীর সম্পর্কই শুধু ব্যাখ্যা করে না, কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁর সৃষ্টির অধিকর্তা ও অভিভাবক হিসেবে আদমের উপর আস্থা রেখেছেন তার ব্যাখ্যা দেয়। আদিপুস্তকে এই বাণীর অর্থ হলো পৃথিবীকে ফলবান করো ও রক্ষা করো। আদিপুস্তকে বর্ণিত কেইন ও আবেল হলেন, বিশ্বের ভাই-বোনদের ইতিহাসের শুরু। যদিও কেইন তাই ভাইকে রক্ষা না করে ভূল করেছিল। কেইন তার ভাইকে হত্যার পর ঈশ্বরের ডাকে উত্তর দিয়েছিল; পরে সদাপ্রভু কেইনকে বললেন, তোমার ভাই আবেল কোথায়? কেইন উত্তর দিলো, 'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক *(আদি ৪:৯)*" কেইনকে কিন্তু তার ভাই আবেলের রক্ষক হবারই কথা ছিলো। আর ঈশ্বর চান আমরা সকলে যেন ভাইয়ের রক্ষক হই। বাইবেলের এই কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয় আমাদের জীবনকে সঠিকভাবে যত্ন নিতে এবং অন্যের প্রতি ন্যায্যতা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে; যা অবিচ্ছেদ্য এক ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রকাশ করে।

৩) সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সেবা-যত্নের এক আদর্শ

পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরকে শুধু সৃষ্টিকর্তা হিসেবেই উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি এমন ঈশ্বর যিনি সৃষ্টিরও যত্ন নেন। বিশেষভাবে আদম-হবা ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান। যদিও কৃতকর্মের জন্য কেইনকে অভিশাপ দেওয়া হয় তবুও সৃষ্টিকর্তা কেইনকে একটি রক্ষাকবচ দান করেন যাতে করে তাকে রক্ষা করা যায়। যাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অলঙ্ঘনীয়-মর্যাদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তার সৃষ্ট জীবের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখাও ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ছিল কারণ শান্তি ও সংঘাত পাশাপাশি চলতে পারে না। বিশ্রামবার স্থাপনের অন্তঃনিহিত উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টির প্রতি যত্নদান, যা ঈশ্বরের পূজা করা ছাড়াও, সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা মানা এবং দরিদ্রদের ব্যাপারে দরদ প্রকাশের বিষয়। ঈশ্বর যে বিশ্রামকালের কথা বলছেন, সেখানে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে এবং সে সঙ্গে সৃষ্টির মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি বলা হয়েছে। "কিন্তু সপ্তম বছরে ভূমির বিশ্রামের জন্য বিশ্রামকাল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামকাল হবে। তুমি নিজের ভূমিতে বীজ বপন করতে না এবং নিজের দ্রাক্ষালতাও -- *(লেবীয় ২৫:৪)*।" তার অর্থ হলো, প্রতি সপ্তম বছরে ভূমির জন্য, দাস-দাসী ও যারা ঋণী তাদের জন্য এই বিশ্রামকাল হবে অবসরের কাল। সেই কৃপাবর্ষে যারা নিতান্ত দরিদ্র, তাদেরকে নতুনভাবে জীবন যাপনের একটা সুযোগ করে দেওয়া হয়। যাতে লোকদের মধ্যে দরিদ্রতার অভিশাপ আর না থাকে *(২য় বিবরণ ১৫:৪)*।

প্রাচীনকালের প্রবক্তাগণ, সমাজের দরিদ্রদের প্রতি অন্যায্যতার ব্যবস্থা সৃষ্টি না করে ন্যায় স্থাপনের কথা বলে গেছেন। বিশেষভাবে আমোস ও ইসাইয়া নিরন্তর দরিদ্রদের বিষয়ে ন্যায্যতা দাবী করেছেন; যারা সুরক্ষা ও ক্ষমতার অভাবে ঈশ্বরের নিকট কাতর আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে এবং যিনি সর্বদা তাদের প্রতি নজর রেখে চলেছেন *(আমোস ২:৬-৭)*।

৪) যিশুর পালকীয় কাজে সেবা-যত্নদান

যিশুর জীবন ও সেবাকাজ মানবজাতির প্রতি স্বর্গস্থ পিতার ভালোবাসারই প্রকাশ। নাজারেথের সমাজগৃহে যিশু নিজেকে প্রকাশ করেছেন একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে এবং এব্যাপারে সাধু লুক তাঁর মঙ্গলসমাচারে লিখেছেন, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত কওে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে (৪:১৮-১৯)।এতে প্রমাণিত হয়- পিতা ঈশ্বরই যিশুকে এ প্রেরণ কাজ দিয়েছেন। যিশু তাঁর করুণা ও দয়ায় রোগাক্রান্তকে কাছে টেনে সুস্থ করেছেন, পাপীকে পাপমুক্ত করে নতুন

জীবন দিয়েছেন। কারণ যিশু হলেন উত্তম মেষপালক, যনি তাঁর মেষদের যত্ন নেন। "আমি প্রকৃত মেষপালক। আমি আমার মেষগুলোকে জানি আর আমার মেষগুলোও আমাকে জানে *(যোহন ১০:১৪)*। যিশু উত্তম মেষপালক, তাই তিনি তার মেষশাবকদের সঠিকভাবে লালন-পালন করেন। তিনি উত্তম সামারীয়, যিনি নত হয়ে আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেন এবং তার সার্বিক যত্ন নেন।

তাঁর প্রেরণ কর্মের শেষে আমাদেরকে দাসত্ব ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রভু যিশু ক্রুশের উপর নিজেকে উৎসর্গ করে সেবা ও ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দেন। তিনি আমাদের জন্য ভালোবাসার পথ খুলে দেন। আমাদের সবাইকে তিনি বলেন,"আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের জন্য যা করেছি তোমরাও তা কর কর *(লুক ১০:৩৭)*।"

৫) যিশু খ্রিস্টের অনুসারীদের জীবনে সেবা-যত্নের সংস্কৃতি

ভালবাসার উপর ভিত্তি করে আদি মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দয়ার কার্যক্রম চর্চা করা হতো। আদি খ্রিস্টমণ্ডলীতে খ্রিস্টের অনুসারীগণ এই দয়ার কাজটি ভালোভাবেই করতো *(শিষ্য ৪:৩৪-৩৫)*। তারা তাদের সমাজকে একটি স্বাগত আবাস হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তারা সবসময় মানবিক প্রয়োজন এবং যারা প্রকৃতপক্ষে অভাবী তাদের পাশে দাঁড়াতেন। দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটানো, মৃতদের সৎকার, অনাথ ও প্রবীণদের যত্নদান তাদের জন্য একটি প্রচলিত নিয়মই হয়ে উঠেছিলো। পরবর্তী সময়ে প্রথম যুগের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে বদান্যতার অভাব দেখা দিলে মণ্ডলীর পিতৃগণ জোর দিয়ে বলতে থাকেন, ঈশ্বরের মতে সম্পত্তি হচ্ছে সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে।

সাধু আম্ব্রোসের মতে প্রকৃতি অকৃপণভাবে সবার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিয়েছে, এবং এতে সবারই সমান অধিকার আছে। কিন্তু মানুষের লোভের কারণে প্রকৃতির এ সম্পদ মাত্র কিছু সংখ্যক মানুষের ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রথম কয়েক শতাব্দির অত্যাচারের পর নতুনভাবে প্রাপ্ত স্বাধীনতা মণ্ডলী সমাজ এবং সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যবহার করেছে। সময়ের প্রয়োজনে খ্রিস্টীয় সেবা-যত্নদানের কাজে নতুন প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ইতিহাসে মণ্ডলীর সেবা-যত্ন কার্যক্রমের ব্যবহারিক কাজের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। দরিদ্রদের মাঝে মণ্ডলীর কাজসমূহ অনেকাংশে ভীষণভাবে গঠিত ও সুশৃঙ্খলিত ছিল। হাসপাতাল, দরিদ্রগৃহ, এতিমখানা, পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য বাসস্থান, পর্যটকদের আশ্রয়কেন্দ্রের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য।

৬) যত্নদানের সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে মণ্ডলীর সামাজিক মতবাদের নীতিগুলো

মণ্ডলীর সামাজিক মতবাদের নীতিগুলো শতাব্দিকাল ধরে পিতৃগণের ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্টতা লাভ করে সক্রিয়ভাবে দানশীল কাজের মধ্যদিয়ে বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। এ মতবাদ সদিচ্ছা পোষণ করে এমন সব লোককে একটি মূল্যবান পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে দেয়া হয়েছে যারা মানুষের মর্যাদার উন্নয়নে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা, ভাল কোন কিছুর অনুসরণ এবং সৃষ্টিকে রক্ষার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও অধিকার উন্নয়নে সেবা-যত্ন

খ্রিস্টধর্মে একজন মানুষ সমন্ধে যে ধারণা রয়েছে সেটিই পুরোপুরি মানব উন্নয়নের ধারণাকে পোষণ করে। একজন ব্যক্তি সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থকে নয়, কিন্তু পারস্পারিক সম্পর্ককে ইঙ্গিত করে। এটা বর্জনকে নয় কিন্তু অর্ন্তভূক্তিকে নিশ্চিত করে। এটি দুর্লভ ও অলঙ্ঘনীয় কিন্তু এটা শোষণ নয়। প্রতিটি নারী-পুরুষের মধ্যে যে উদ্দেশ্য বিদ্যমান - তা শুধু নিজের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে - পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজের সাথে বসবাস করার জন্য, যেখানে সবার মর্যাদা সমান। এই মর্যাদাদান থেকেই মানুষ তার অধিকার লাভ করে। সুতরাং 'মানুষের কর্তব্য হলো গরিব, অসুস্থ, পরিত্যক্ত সমস্ত প্রতিবেশী, দূরের বা কাছের, অতীত বা বর্তমানের সবাইকে স্বাগত জানানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সেবা-যত্ন

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি দিক পূর্ণতা লাভ করে যখন এসবকে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এসব সামাজিক ব্যবস্থাপনার কারণে মঙ্গল সাধন দলগত বা ব্যক্তিগত হতে পারে। তবে আমাদের সব পরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করতে হবে সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং সে সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর তা কি প্রভাব ফেলবে তা বিবেচনায় নিয়ে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে আমরা একই নৌকায় ভয়ার্ত ও দিক-নির্দেশনাহীন। কিন্তু একই সময়ে এটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যে, কোভিড-১৯ আমাদেরকে এক সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। সুতরাং বলা যায়, নিজে নিজে কেউ সব সমাধান করতে পারে না এবং কোনো রাষ্ট্রও বিচ্ছিন্ন থেকে নিজের জনগণের মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে না।

সংহতির মাধ্যমে যত্নদান

সংহতি হলো বাস্তবে অন্যের প্রতি আমাদের ভালোবাসার স্পষ্ট বহিপ্রকাশ, তা অসচ্ছ কোন অনুভূতি নয়, কিন্তু সর্বসাধারণের ভালোর জন্য, নিজেকে নিয়োজিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার অর্থ প্রত্যেকের মঙ্গল করা, যেহেতু আমরা সকলের জন্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংহতি অন্যকে - তা যেকোন ব্যক্তি বা জনগণই হোক শ্রদ্ধা করতে সাহায্য করে। এমন নয় যে কাউকে অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেয়া বা দূরে সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু বাস্তবে সবাইকে আমাদের প্রতিবেশী গণ্য করে সবার সঙ্গে যাত্রা আর এ যাত্রা হলো ভোজসভায় অংশগ্রহণের যাত্রা। প্রভু পরমেশ্বরের ডাকা জীবনের এই মহাভোজে আমরা সবাই সমানভাবে আমন্ত্রিত।

যত্নদান ও সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ

সমস্ত সৃষ্ট জীব যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সে সমন্ধে "তোমার প্রশংসা হোক" নামে সর্বজনীন পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আমাদের সামনে শুধু দরিদ্রদের কান্না নয়। সে সঙ্গে সমস্ত সৃষ্টির কান্নাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। আমাদের সার্বক্ষণিক সতর্ক মনোযোগ আমাদের সবার আবাসস্থল, এই পৃথিবী এবং আমাদের অভাবগ্রস্ত ভাই-বোনদের প্রতি যত্নবান হতে সাহায্য করে। এ পর্যায়ে আমি আবারও বলতে চাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের গভীর সংযোগ কার্যকর হতে পারে না, যদি আমার হৃদয়ে উষ্ণতার অভাব থাকে এবং সে সঙ্গে অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধের অভাব থাকে। সৃষ্ট জীবের প্রতি শান্তি, ন্যায্যতা, প্রকৃতির যত্ন-এগুলো আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করার মত তিনটি প্রশ্ন নয়; এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদি একসাথে না দেখি তাহলে আমরা ভিন্ন কোন পরিবর্তিত অবস্থায় পতিত হই।

৭। সর্বজনীন পথ নির্দেশক দিক-নির্দেশনা যন্ত্র

বর্তমানে অপচয়ের সংস্কৃতির (যা কোন জাতির নিজের মধ্যে বা অন্য জাতির সঙ্গে বেড়ে উঠা অসমতার দ্বারা সৃষ্ট) প্রভাবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে অসমতা সৃষ্ট হচ্ছে। এই সময়ে সরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, বিজ্ঞানী, যোগাযোগকর্মী ও

শিক্ষকমণ্ডলীর, সবার কাছে আমি বিশেষ অনুরোধ রাখবো যাতে তারা সবাই এই নীতিসমূহকে এমন এক দিকনির্দেশক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, যা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় একটি সর্বজনীন গ্রহণীয় দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে সুন্দর মানব সভ্যতার ভবিষ্যত নিশ্চিত করে। সর্বজনীন এই নির্দেশনা আমাদেরকে প্রতিটি ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সাহায্য করবে, সবার মঙ্গলের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং যারা দরিদ্র, রোগ-শোক, দাসত্ব, অস্ত্রের সংঘাত এবং বৈষম্যের কারণে জর্জরিত, বিশেষভাবে তাদের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমি সবাইকে আহ্বান করবো, এ দিকনির্দেশক যন্ত্র হাতে নিয়ে, সেবাদানের সংস্কৃতি, বিরাজমান বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য দূর করার পথে কাজ করার ব্যাপারে সাক্ষী হওয়ার জন্য।

এসব সামাজিক নীতিমালার দিক-নির্দেশক যন্ত্র যত্নদানের সংস্কৃতির উন্নয়নে অত্যন্ত প্রয়োজন, যা শুধু বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্কের প্রয়োজনের দিকে নির্দেশ করে না, ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, একাত্মতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। এ ব্যাপারে আমাদেরকে মানুষের মৌলিক অধিকার বুঝতে হবে ও তা রক্ষা ও উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে। একইভাবে মানবিক আইনকে সম্মান করা জরুরী বিশেষভাবে এখন, যখন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অবারিতভাবে চলছে। উদ্বেগজনক হলো, অনেক এলাকার ও সম্প্রদায়ের মানুষ মনেই করতে পারে না কখন তারা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করেছে। অসংখ্য শহর বা নগর নিরাপত্তাহীনতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে; বিস্ফোরক, ভারী অস্ত্রসস্ত্র ও ছোট অস্ত্রের এলোপাথারি আক্রমণের মাঝে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। শিশুরা পড়াশুনা করতে পারছে না। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে কেউই তাদের পরিবারকে সাহায্য করতে পারছে না। যেসব এলাকায় আগে মানুষ কখনও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, এখন সেখানে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। মানুষ শুধু তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে যেতেই বাধ্য হচ্ছে না, সে সঙ্গে পারিবারিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিকড়ও পিছনে ফেলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এসব সংগ্রামের বিভিন্ন কারণ থাকলেও এদের ফলাফল একই। আর তাহলো ধ্বংস ও মানবতার বিপর্যয়। আমাদের এখন থেমে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে- পৃথিবীকে এমন কি ধাবিত করছে সংঘাতকে স্বাভাবিক কিছু ভাবার এবং কেমন করে আমাদের চিন্তাধারা ও হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে, যাতে করে আমরা একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তির জন্য কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছি।

যে সম্পদ অস্ত্র তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে (বিশেষভাবে আনবিক অস্ত্র), তা আরও গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ কাজে, যেমন ব্যক্তি নিরাপত্তা, শান্তির উন্নয়নে ও অত্যন্ত জরুরী মানব উন্নয়নে, দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং স্বাস্থ্য সেবার সংরক্ষণে ব্যয় করা যেত। কোভিড-১৯ মহামারী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে এসব কারণে। যে অর্থ অস্ত্র তৈরী ও অন্যান্য সামরিক কাজের ব্যয় হচ্ছে, তা দিয়ে যদি একটি বৈশ্বিক ফাণ্ড তৈরী করা যায়, তবে তা দিয়ে স্থায়ীভাবে দারিদ্র দূর করা এবং অতিদরিদ্র দেশসমূহের উন্নয়ন করা সম্ভব।

৮। যত্নদানের সংস্কৃতির জন্য শিক্ষা

যত্নদানের সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষণ প্রক্রিয়া। সামাজিক নীতির দিক-নির্দেশক যন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় এবং নির্ভরশীল প্রমাণিত হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে;

- যত্নদানের সংস্কৃতি শুরু করতে হবে পরিবারে। এই পরিবারেই শুরু হতে পারে কীভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই বসবাস করতে পারে। পরিবারকে অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেখভাল করতে হবে।
- পরিবার ছাড়াও স্কুল-কলেজে অনুশীলন করতে হবে। এই ব্যাপারে গণমাধ্যমকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে- যেনো, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করতে পারে। ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা হলো একটি স্তম্ভ।
- ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতাগণ ও তাদের অনুসারিরা বৃহত্তর পরিসরে মূল্যবোধ, সমাজের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকা সত্বেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অভাবী ভাই-বোনদের প্রতি সহানুভূতি থাকা।
- সরকারের সেবা প্রতিষ্ঠান, সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা যেখানে কর্মরত রয়েছেন, তারা বিভিন্ন উপায়ে এ ব্যাপারে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন।

আমি আশা করি আমার এ আবেদন, যা শিক্ষার বিষয়ে বৈশ্বিক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে, তা মেনে নিয়ে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হবে।

৯। যত্নদানের সংস্কৃতি ছাড়া কোনভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়-

যত্নদানের সংস্কৃতি আসলে একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিশ্রুতি; যা সবার সদিচ্ছা এবং মর্যাদা রক্ষা ও বাড়িয়ে তোলা, সেবা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ইচ্ছা, পুনর্মিলন ও সুস্থতার জন্য কাজ করা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও গ্রহণযোগ্যতাকে এগিয়ে নেয়। ফলশ্রুতিতে যত্নদান শান্তির পথে সুবিধাজনক পথ এর প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ক্ষত নিরাময় করার জন্য শান্তির পথের প্রয়োজন আছে। শুভ চেতনার নর-নারীকে এগিয়ে আসতে হবে শান্তি স্থাপনের জন্য।

বর্তমান সংকটে মানবতার তরী যখন ঝড়ে আন্দোলিত, তখন সে তরী আরও শান্ত ও নির্মল দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। মানবতা বর্তমানে যে সংকট ও কষ্টের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সকলের হাল ধরা ও দিক নির্ণয় গ্রহণ করা, যাতে সামাজিক মর্যাদা ও মৌলিক সামাজিক নীতি স্থাপন করা সম্ভব হয়। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিৎ আমাদের আশার জননী ও সাগরের ধ্রুবতারা মা মারীয়ার দিকে। আসুন, সবাই মিলে শান্তি-ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব-একাত্মতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা-গ্রহণযোগ্যতার দিকে ধাবিত হই। আমরা যেন অন্যকে কখনও অসম্মান করার প্রলোভনে পতিত না হই। আমরা অন্যের বিরুদ্ধে প্রলোভন ও অমর্যাদার বীজ বপন না করে যেনো একে অন্যের প্রতি যত্নশীল হয়ে ভাইবোনের একটি গ্রহণশীল সমাজ গঠন করি।

৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তর : জেরাল্ড রড্রিক্স

নিজেদের কথা বলি সুখী পরিবার গড়ি

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

বিবাহ হল ভালবাসার বন্ধন। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে এটা হল একটি সাক্রামেন্ত ও একটি সন্ধি। খ্রিস্টীয় বিবাহ অবিচ্ছেদ্য। বিবাহের মধ্যদিয়েই পরিবার গঠন করা হয়। পরিবার হল আদিম প্রতিষ্ঠান, শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরিবারের মধ্যদিয়েই শিশু বেড়ে ওঠে গঠন লাভ করে। পরিবারের মধ্যে বিশ্বাস, ভালবাসা, সত্যবাদিতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহনশীলতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এগুলো পরিবারের বন্ধনকে আরও মজবুত করতে সহায়তা করে। পরিবারকে আরও সুখী সুন্দরও আনন্দময় করতে হলে পরিবারে সহভাগিতা দরকার। নিজেদের জীবনের সহভাগিতার মধ্যদিয়ে পরিবার সুখী সুন্দর হয়ে ওঠে।

পরিবার হল পরের ভার বহন করা। অর্থাৎ যাকে নিয়ে পরিবার গঠন করে তার দায়িত্ব গ্রহণ করা ও সেই দায়িত্ব পালন করা। পরিবারকে সুখী সুন্দর করতে হলে নিজেদের পরিবারকে নিজেদের সুন্দর করে সাজাতে হয়। বর্তমান বাস্তবতায় চারিদিকে অনেক প্রতিযোগিতা, চাহিদা, ভোগবাদ ও আধুনিকতার মধ্যে আমাদের পরিবারকে কিভাবে সাজাব এটা আমাদের পরিবারের উপর নির্ভর করে। অনেক মানুষ আছে যাদের সম্পদ আছে ঠিকই কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর নেই। আবার অনেকের সম্পদ নেই, সম্পর্কও ভাল নেই। আবার অনেকের সম্পদ নেই কিন্তু সম্পর্ক ভাল আছে তারাই সুখী পরিবার গঠন করছে। সুখ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিকতায় নয়, নিজের কাছেই রয়েছে। অনেকে অনেক পেয়েও অসুখী, আবার কেউ অল্প পেয়েও সুখী। পরিবারকে সুখী করতে হলে অন্য পরিবারের সাথে তুলনা করতে হয় না। যারা বেশি তুলনা করেন তারা বেশি অসুখী হন। তাই জীবন থেকে তুলনা করা বাদ দিতে হবে। এই তুলনা হতে পারে জিনিস পাওয়ার ক্ষেত্রে, বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আমার স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে আমি যখন মনে মনে বা অন্যের সাথে তুলনা করি তখন আমি অসুখী হয়ে উঠি। সে যে রকম আছে তাকে সেইভাবে গ্রহণ করতে হয়। মানিয়ে নিতে হয়। তার কোন দিক পছন্দ না হলে খোলামেলা দুজনে আলাপ করতে হয়। তাহলে আলাপের মধ্যদিয়ে অনেক কিছু সমাধান হয়ে যাবে। পরিবার সুখী সুন্দর হবে।

পরিবারকে সুখী করতে হলে সহভাগিতা একান্তভাবে দরকার। যে কোন ক্ষেত্রে একে অপরে যদি সহভাগিতা করে তাহলে তারা উপলব্ধি করবে তারা একে অন্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের মধ্যে ভালবাসা, আস্থা বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে পরিবারকে সুখী করতে হলে নিজেদের জীবন সহভাগিতা করতে হয়। যখন একে অন্যে খোলামেলা আলাপ করবে, দরদবোধ দিয়ে পরস্পর পরস্পরের কথা শুনবে তখন পরিবার সুন্দর হবে। প্রত্যেকজন ব্যক্তি লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশিরভাগ সময় অন্যকে নিয়ে কথা বলতে সমালোচনা করতে পছন্দ করে। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে নিজেদের নিয়ে, নিজেদের পরিবার ও সদস্যদের নিয়ে কথা বলতে হবে। আলোচনা করতে হবে। সরলতা ও দুর্বলতাগুলো দেখতে হবে। কিভাবে দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করা যেতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে। যত বেশি পরিবারে পরিবারের কথা আলোচনা করা, সহভাগিতা করা হবে, একে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে তত বেশি পরিবার সুখী সুন্দর হয়ে উঠবে।

পরিবারে আরেকটি বিশেষ দিক হল পারস্পরিক সম্মানবোধ। যে যেমনই হোক না কেন সবার ব্যক্তি মর্যাদা রয়েছে। তাই ব্যক্তিকে সম্মান করতে হয়। মর্যাদা দিতে হয়। কেউ যদি ভুল করে তাহলে সবার সামনে নয়, বকাঝকা করে নয়, সুন্দরভাবে ব্যক্তিকে একা গঠনমূলক সংশোধন দিতে হবে। একজন যখন অন্যজনকে সম্মান করে তখন সেও সম্মান লাভ করে। পরিবারের ছোটদের স্নেহ, বড়দের শ্রদ্ধা করতে হয়। মোট কথা যার যে সম্মান সে যেমনই হোক না কেন তাকে তা দিতে হবে। প্রত্যেকজন ব্যক্তির ও পরিবারের সবল এবং দুর্বল দিক আছে এবং থাকবেই। এগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে হবে। দুর্বল দিক নিয়ে অন্যের সাথে আলাপ করতে হবে না। আজকে যে শুভাকাঙ্ক্ষী আগামীকাল নাও হতে পারে। তাই নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদের করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকজন মানুষকে তার সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ব্যক্তিকে তার সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করবে। একটি বাস্তব ঘটনা -একটি মেয়ে অন্য পরিবার থেকে বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়ী এসেছে। শ্বশুরবাড়ীতে সে কাউকেই আপন করতে পারেনি। শ্বশুরবাড়ী তার ভাল লাগে না। সে আশে-পাশে যার কাছেই যায় সবার সমালোচনা করে। কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। সবার কাছে সে ভাল হতে চায়। একটি কথা সত্য হলে আরও দুটো কথা বানিয়ে বলে। এভাবে সে নিজে গুরুত্ব চায় এবং শ্বশুরবাড়ীর সবাইকে অপদস্ত করতে চায়। বাড়ীর বউমা যে তাদের সম্পর্কে বানিয়ে মিথ্যা বলেছে, মানুষের কাছে যা বলেছে সব আবার তাদের কাছে ফিরে এসেছে। সবাই তার শ্বশুরবাড়ীর মানুষদের কাছে সব বলে দিয়েছে। এতে পরিবারের মধ্যে চরম অশান্তি। শ্বশুরবাড়ীর কেউ বউমাকে পছন্দ করে না। সবাই তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে। শ্বশুরবাড়ীর সবাই তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে বউমা তার ভুল বুঝতে পেরে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা চায় এবং এই ধরনের কাজ আর করবে না বলে সংকল্প নেয়। আমাদের পরিবারে আমরাই অশান্তি ডেকে আনি। মেয়েরা যখন পরিবার ছেড়ে স্বামীর বাড়ীতে আসে তখন স্বামীর বাড়ীই তার ঠিকানা হয়। সবার ভাল-মন্দ দেখা তার দায়িত্ব। তারও ভাল-মন্দ দেখা পরিবারের সবার দায়িত্ব। সবার সাথে পরিবারের খোলা-মেলা আলাপ করতে হয়। কোন দিকে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হলেও সে বিষয়ে বলতে হয়। যত বেশি খোলা-মেলা আলাপ করবে, সহভাগিতা করবে পরিবারের সবাই তাকে তত ভালবাসবে। পরিবার তত বেশি সুখী হয়ে উঠবে।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহনশীলতা একান্তভাবে দরকার। বর্তমান যুগে সবার মধ্যেই একটি অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ যেন কাউকে ছেড়ে কথা বলতে চায় না। কেউ কেউ চিন্তা করে আমিও কম কিসে? আমি আধুনিক মেয়ে কোন দিকে কাউকে ছাড় দিব না। বউমা-শাশুড়ীকে সহ্য করতে পারে না। আবার শাশুড়ী বউমাকে সহ্য করতে পারে না। এর জন্যে দেখা যায় পরিবারে অনেক অশান্তি। কোন কোন বউমা মনে করেন শাশুড়ীরা তার বাড়ীর কাজের মেয়ে যত পারে তাদের তত খাটায়। যদি কাজ করতে না পারে তাহলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এ ধরনের বউমাদের চিন্তা করা দরকার আমিও একদিন শাশুড়ী হব আমার সাথে আমার বউমা যদি এমন আচরণ করে আমার কেমন লাগবে? শাশুড়ীরা মায়ের মত। বউমারাদের এক মা ছেড়ে এসে অন্য মাকে আপন করতে হয়। বেশির ভাগ বউমাদের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন দিকে বিরাট পার্থক্য। এই পার্থক্য আলাপ আলোচনার মধ্যদিয়ে দূর করতে হয়। বর্তমানে অনেক পরিবার এই সহশীলতার অভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই ভাঙ্গন রোধ করতে হলে সহ্যশক্তি ও ত্যাগস্বীকার বাড়াতে হবে। পরিবারের মধ্যে অনেক ধৈর্য্য ধরতে হবে। ধৈর্য্য না থাকলে পরিবার সুন্দর হবে না। একবার ৮০ বছর অতিবাহিত দম্পতিকে জিজ্ঞেস করা হল আপনাদের দীর্ঘ জীবনে পারিবারিক জীবনের রহস্য কি? তারা উত্তর দিল-আমরা সহনশীল ছিলাম, ধৈর্য্য ধারণ করেছি, পরস্পরকে বিশ্বাস ও সম্মান করেছি এবং সবসময় সত্যবাদিতাকে জীবনে স্থান দিয়েছি।

আমাদের পরিবারে সত্যতাকে স্থান দিতে হয়। এই সত্যই পারে আমাদের পরিবারকে এক রাখতে। সুখী সুন্দর করতে। আমাদের পরিবারে আমরা নাজারেথের আদর্শ পরিবারকে সবসময় সামনে রাখতে পারি। মা মারীয়ার আদর্শ নম্রতা, ধৈর্য্য, সহশীলতা, পরিশ্রমী, স্নেময়তা, উদারতা এগুলো আমাদের জীবনে চর্চা করতে পারি। জীবনকে এবং পরিবারকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। মায়ের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করতে হয়। যে পরিবার একসাথে প্রার্থনা করে সে পরিবার একসাথে থাকে। আমরা একসাথে থাকতে চাই তাই প্রার্থনার বিকল্প নাই। প্রার্থনাই পারে আমাদের এক রাখতে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ সব সময় পরিবারের জন্য দরকার। বর্তমানে ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে ব্যস্ত থাকার কারণে আমাদের প্রার্থনার সময় খুব কম। যতই ব্যস্ত থাকি না কেন আমাদের সময় করে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে মিলন হয়। মনের মধ্যে প্রশান্তি আসে। জীবনের পরিবর্তন ঘটে।

পরিবারকে সুখী করতে অন্যের দিকে নয় নিজের দিকে তাকাতে হয়। নিজেদের কথা পরিবারের নিজেদের সঙ্গে সহভাগিতা করতে হয়। পরিবারকে সুখী সুন্দর করতে হলে- ভালবাসা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, নম্রতা, ত্যাগস্বীকার, ক্ষমা ও দয়া প্রভৃতি গুণাবলী একান্তভাবে দরকার। পরিবারে যে যেমন আছে তাকে সেভাবে গ্রহণ করতে হয়। পরিবারকে সুখী করতে হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ দরকার। পরিবারে সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যদিয়ে পরিবার সুখী সুন্দর হয়ে উঠবে। আমাদের পরিবার নাজারেথের পরিবারের ন্যায় আদর্শ পরিবার হয়ে উঠবে॥ ৯

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা)

১ তেজকুনীপাড়া, ঢাকা - ১২১৫।

রেজি নং: ৩৭/৮৭, ০৭/০১ ও ১০/০৪

ফোন: ০২-৪৮১১৪৪৩৫, ০১৬৮০-৯৪৩৮৭০

ই-মেইল: npcsml.dhk@gmail.com

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

তারিখ: ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার

সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট

স্থান: তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ১, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

এতদ্বারা "নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ" এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা সমিতির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সাধারণ সভায় সদস্য/সদস্যাদের পাশ বই ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

রুবেন গোনসালভেজ
প্রেসিডেন্ট
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

ষ্ট্যান নিউটন গোমেজালভেজ
সেক্রেটারী (কো-অপ্ট)
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

চির বিদায়ের প্রথম বার্ষিকী

প্রয়াত অমল রিবেরু

জন্ম: ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে
গেল যে জন সাথে প্রভু সাথে
আছে অনন্ত জীবন

তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার গৃহে চলে গেছো একটি বছর হয়ে গেছে। তোমার শূণ্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন খ্রিস্টির আদর্শে জীবন যাপন ও তোমার সন্তান দুটোকে আদর্শ মানুষের মতো গড়ে তুলতে পারি। জীবন শেষে একদিন ঈশ্বরের রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

স্ত্রী: নীমা শিশিলিয়া পালমা
ছেলে: সুজয় লেনার্ড রিবেরু
মেয়ে: সীথি জুলিয়েট রিবেরু
গ্রাম: জয়রামবের, রাঙামাটিয়া মিশন
বর্তমানে মগবাজার, রমনা, ধর্মপল্লী।

তোমার ভালবাসার
পরিবারবর্গ

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

সাধারণ অর্থে পজিটিভ প্যারেন্টিং হলো পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক যা যত্ন সহকারে সন্তানদের জীবন গঠনে শেখানো, নেতৃত্ব দেওয়া, যোগাযোগ করা, এবং ধারাবাহিকভাবে ও নিশর্তভাবে সন্তানের প্রয়োজনগুলিকে গুরুত্বরাপ করা।

পজিটিভ প্যারেন্টিং কি?

শিশু বা সন্তান লালন-পালনে করার কলাকৌশল। অর্থাৎ আপনি আপনার শিশুটিকে কিভাবে বড় করে তুলছেন। আপনার শিশুর সাথে আপনি কেমন আচরণ করছেন, তার কিভাবে যত্ন নিচ্ছেন, তাকে কি ধরণের শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলছেন। একে আমরা পজিটিভ প্যারেন্টি বলতে পারি।

পজিটিভ প্যারেন্টিং-এর প্রকারভেদ?

ডায়ানা বাউমরাইন্ড যিনি ছিলেন একজন সাইকোলজিস্ট ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতা-মাতার আচরণ শিশুর মনস্তাত্তিক দিককে কতোটা প্রভাবিত করে তা নিয়ে বিশ্লেষণ প্রদান করেন যা এখন পর্যন্ত বর্তমান বাস্তবতার সাথে প্রাসঙ্গিকতা রাখে। তিনি পজিটিভ প্যারেন্টিকে প্রাথমিকভাবে তিন (৩) ধরণের পজিটিভ প্যারেন্টিং শনাক্ত করেছিলেনঃ

১. **স্বৈরাচারী** (Authoritarian)

২. **কর্তৃত্বসম্পন্ন/ কর্তৃত্বপূর্ণ** (Authoritative)

৩. **সহনশীল** (permissive)

পরবর্তীতে ম্যাকোবি এবং মার্টিন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই মতবাদ আরেকটু বিস্তৃত করেন। এই দু'টি বিষয় হলো :

Demandingness : যা দ্বারা বোঝায় বাবা-মা তাদের সন্তানের আচরণ নিয়ন্ত্রণে কি পদ্বতি অবলম্বন করেন

Responsivenness : যা দ্বারা বোঝায় বাবা-মা তাদের সন্তানের মানসিক এবং বিকাশগত প্রয়োজনে কিভাবে সাড়া দেন।

বর্তমানে যে, চার ধরণের প্যারেটিং স্টাইল নিয়ে আলোচনা করা হয় তা এই দুজনেরই তৈরি। তারা বাইমরাইন্ডের পারমিসিভ প্যারেটিংকে দুইভাগে ভাগ করেন-

১. Permissive parenting বা Indulgent parenting (প্রশ্রয় দেয়া)

২. Neglectful parenting বা Uninvolved parenting (উপেক্ষা করা)

চার ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইল এবং শিশুদের উপর তার প্রভাব

স্বৈরাচারী (Authoritarian parenting)

স্বৈরাচারী পিতা-মাতারা শিশুদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা তাদের সন্তানের কাছ থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করে। এই ধরনের বাবা-মায়েরা শিশুদের মতামত এবং পছন্দ অপছন্দকে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয় না। তার একতরফা নিজেদের মতামত শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়াকেই সঠিক মনে করে থাকেন। এই ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইলে শিশুদের আলাদা কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না।

এই ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইলে বাবা - মায়েরা সন্তানের অন্ধআনুগত্য প্রত্যাশা করেন। তারা যেটা বলবেন সেটাই হতে হবে এই নীতিতে বিশ্বাসী থাকেন। এই ধরণের প্যারেন্টিং এ খুব প্রচলিত একটি বাক্য হচ্ছে- "কারণ আমি বলেছি তাই এটাই তোমাকে করতে হবে।" তাদের মতামতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো খুবই খারাপ আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই স্টাইলে শাস্তির পরিমাণ এবং ধরণও খুব কঠিন হয়। এসব বাবা-মায়েরা সাধারণত তাদের এই আচরণকে সন্তানের প্রতি "কঠোর ভালাবাসা (Tough Love) হিসেবে আখ্যায়িত করে তা ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেন।

ফলাফল

স্বৈরাচারী পিতা-মাতার সন্তানেরা সাধারণত প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে বড় হয়। তারা হীনমন্যতা এবং প্রায় সময় অপরাধবোধে ভোগে। এছাড়াও তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের প্রচুর ঘাটতি থাকে। ফলে সমাজে সবার সাথে খাপ খাইয়ে চলাটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যাও বেশি দেখা যায় এবং পড়াশোনাতেও খুব একটা ভালো করতে পারে না।

কর্তৃত্বসম্পন্ন (Authoritative parenting) ঃ

এই ধরনের বাবা-মায়েরা শিশুদের উপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখলেও তাদের প্রতি নমনীয় হয়ে থাকেন। স্বৈরাচারী বাবা-মায়ের মতো তারা সন্তানদের উপর একতরফা নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেন না। তারা শিশুদের কথা শুনেন এবং তাদের পছন্দ-অপছন্দকে মূল্যায়ন করেন।

এসব বাবা-মায়েরা শিশুদের মতামতকে যুক্তি সহকারে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। কর্তৃত্বসম্পন্ন বাবা-মায়ের সন্তানেরা সাধারণত বুদ্ধিমান এবং লেখাপড়ায় বিচক্ষণ হয়ে থাকে।

বাউমরাইন্ডের মতবাদ অনুযায়ী এই ধরণের প্যারেন্টিং এ শিশুরা ভবিষ্যতে যথেষ্ট আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, স্বাবলম্বী এবং সমাজে

সকলের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠে।

কর্তৃত্বসম্পন্ন বাবা-মায়েরা শিশুদের উপর বল প্রয়োগ না করে তাদেরকে যেকোনো বিষয়ে যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে থাকেন। তারা শিশুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয় স্বাধীনতার সমন্বয় করে আগামীর জন্য গড়ে তুলেন।

সেই সাথে নিজেদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের এবং আচরণের কারণ শিশুর কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এ ধরণের প্যারেন্টিং স্টাইলকে গণতান্ত্রিক প্যারেন্টিংও বলা হয়।

ফলাফলঃ

এ ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইলে শিশুদের চিন্তা ধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত থাকে। ভবিষ্যতে তারা বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। এসব শিশুরা সুখী হয়, অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকে, সামাজিক দক্ষতা ভালো থাকে এবং পড়ালেখাতেও ভালে করে। এদের পরবর্তীতে মানসিক জটিলতায় ভোগার ঝুঁকিও কম থাকে।

সহনশীল থাকা বা প্রশ্রয় দেয়া **(Permissive বা Indulgent Parenting)ঃ Low demandingness High responsiveness.**

এর ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইলে বাবা-মায়েরা সন্তানদের নিয়ম তৈরি করে দিলেও সেই ব্যাপারে তেমন একটা তদারকি করেন না। এক কথায় তারা শিশুদের সীমাহীন ছাড় দিয়ে দেন এবং তাদের যেমন খুশি তেমন করে বড় হতে দেন।

স্বৈরাচারী অথবা কর্তৃত্বসম্পন্ন বাবা মায়ের মত শিশুদের প্রতি কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না। ফলে শিশুরা বুঝতে পারে না তাদের জন্য ভুল অথবা সঠিক কোনটি। পারমেসিভ বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানের আচারণগত কোন দিক সুগঠিত করতে গুরুত্বারোপ করেন না। তারা তাদের শিশুদের শাসনের ব্যাপারে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত নমনীয় হয়ে থাকেন।

ফলাফল :

এ ধরনের অভিভাবকেরা বাসার কোন নিয়ম কানুন তৈরি করলেও তাতে ধারাবাহিক থাকতে পারেন না। শিশু একটু কান্নাকাটি করলেই তাকে ছাড় দেন। মূলত এ ধরণের প্যারেন্টিং স্টাইলে অভিভাবকেরা বাবা মায়ের চাইতে বন্ধুর ভূমিকায় বেশি থাকেন।

এই ধরনের প্যারেন্টিং এ শিশুরা লাগামহীনভাবে বেড়ে ওঠে বিধায় তাদের ব্যক্তিত্ব তেমন একটা সুগঠিত হতে পারে না। বাউমরাইন্ডের মতবাদ অনুযায়ী এই ধরনের প্যারেন্টিংয়ে শিশুদের মাঝে মূল্যবোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব থাকতে পারে।

এই ধরনের বাবা-মায়ের শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে মানিয়ে চলতে পারে না। এছাড়াও এসব শিশুদের ক্ষেত্রে ওবেসিটির ঝুঁকি বেশি থাকে কারণ বাবা মা জাঙ্ক ফুড গ্রহণে শিশুকে বাঁধা দেন না এবং তাদের স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস গঠনেও তেমন একটা মনযোগী হয় না।

অবহেলা বা উপেক্ষা করা (Neglectful parentingev Uninvolved parenting) Low demandingness Low responsiveness.

এই ধরনের প্যারেন্টিং এ বাবা-মায়েরা শিশুদের চাহিদা এবং প্রয়োজনের দিকে উদাসীন থাকে। তারা শিশুদের প্রচণ্ড অবহেলায় মানুষ করেন। এই ধরনের বাবা-মায়ের শিশুরা অতিরিক্ত স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এমনকি তারা শিশুদের মতামতের উপর তেমন একটা হস্তক্ষেপ করেন না।

এভাবে বেড়ে ওঠা শিশুদের জীবনে তেমন কোন শৃঙ্খলা থাকে না। এরা জীবনের বেশিরভাগ সময় অযত্নে বড় হয়ে থাকে। বাবা-মায়ের শিশুদের প্রতি তেমন একটা আকাঙ্ক্ষা অথবা প্রত্যাশাও রাখেন না।

এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত বাবা-মায়েদের নিজেদের মানসিক কোন সমস্যা থাকে অথবা তাঁরাও শৈশবে অবহেলায় বেড়ে ওঠে। ফলে তারাও তাদের সন্তানদের অযত্নে বড় করে যা শিশুর ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর।

ফলাফল

এই প্যারেন্টিং স্টাইলের শিশুদের ভবিষ্যতে মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর বেশিরভাগ সময় বাবা মায়ের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যস্ত থাকে। এছাড়াও এই ধরনের শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধের অভাব এবং আচারণগত সমস্যাও দেখা যায়।

বর্তমানে পজিটিভ প্যারেটিং নেতিবাচক প্রভাব : আমরা পিতা-মাতারা শিশুদের জীবনগঠনের আপ্রাণ চেষ্টা করি। আমাদের উদ্দেশ্য সুন্দর কিন্তু প্রয়োগ করতে গিয়ে আমাদের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, কথার ধরণ বা কথার প্রেক্ষাপট কারণে শিশুদের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যা তাদের জীবন গঠনের পাশাপাশি নেতিবাচক চিন্তা-চেতনার বিকাশে ঘটে।

১. দোষারোপ করা (Blami) :

আমরা শিশুদের সঙ্গে এরকম কথা বলি , তুমি সব সময় এরকম, তুমি কথা শোনো না। যখন আমরা এরকম মন্তব্য করি। শিশুরাও প্রতিউত্তর করে বলে আমি কখনোই এমন করি না, আমি সেদিন এটা করলাম। তুমি কখনো শুনতে চাও না। বিশেষ করে টিনএজার বাচ্চারা এই কথাগুলো বলে ফেলে। এই জায়গাটায় জরুরী বিষয়টা হলো আমরা যখন কথা বলি। আমরা একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে উদাহরণ তুলে ধরি। বর্তমান অবস্থাকে টেনে কথা বলি। ফলে এর প্রভাবটি পড়ে। কেননা শিশুদের ব্রেণটা শিশুদেরই ব্রেণ। ছয় বছরের বাচ্চার ব্রেণ তো আমার মতো চল্লিশ বছরে মতো ব্রেণ নয়। যখন ছয় বছর শিশুর মতো না বুঝিয়ে, আমার চল্লিশ বছরে ব্রেণ দিয়ে তাকে পজিটিভ প্যারেটিং ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দ ধরে ধরে বলি তুমি এরকমভাবে কথা বলো। যা তাকে সরাসরি দোষারোপ করা হয় ফলে শিশুটি হীনমন্যতায় ভোগে।

২.কুবচনে / আজেবাজে নামকরণ (Name Calling)

আজেবাজে নামকরণ ভীষণ জনপ্রিয় বাংলাদেশে । আমরা আমাদের বাচ্চাদের বলতে শুরু করি "তুই একটা গাধা", "তুই রাম ছাগল" অনেক ধরনের পশুপাখির আজেবাজে নামকরণ এখানে চলে আসে। আমরা কখনোই মনে করি না এটা আবেগীয় অপরাধ। এটা বিশ্বাসও করতে চাই না। আমরা ধরেনি, এটা তো বলাই যায় এটা আমার বাচ্চা। "না" এটা বলা যায় না এতে বাচ্চার খুব কষ্ট হয় । আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু এ ধরনের কথা শুনে আমাদের কষ্ট হয়েছে। Name Calling পজিটিভ প্যারেন্টিং ভীষণ বাজে একটা দিক এই আবেগীয় কথাটি বাচ্চাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করে যদি আমরা বাহিরের চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। তাই পজিটিভ প্যারেটিং এই আবেগীয় Name Calling বিষয়টি কখনোই ভালো নয়।

৩.বক্তৃতা এবং নৈতিকতা (Lecturing and moralizion): একটা কথা বর্তমানে খুব প্রচলিত, বাংলাদেশে নাকি বলার মানুষের অভাব হয় না, এরা আবার নৈতিকতার ভাণ্ডার নিয়ে থাকে।" Lecturing and moralizion বিষয়টি আমরা টিনএইজার দের সাথে করি। কারণ টিনজারা যখন টিনএইজার পেরিয়ে Adultness দিকে অগ্রসর তখন তাদের ব্রেন Adult ব্রেনের কাছাকাছি। ১০-১২ বছরে বয়সকালে যা বলতাম তাই শূনতো কিন্তু এই বয়সে এসে শুনতে চায় না। মুখে-মুখে তর্ক করছে, এটা না, সেটা। আমি যখন একটা কিছু বলছি, সেও দশটা কথা শোনাচ্ছে। আমরাও তখন বড় বড় Lecturing and moralizion শোনাচ্ছি। পিতামাতা বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি জানি আমাদের পরিবারে কখনো এরকম কিছু হয়নি। তুমি এরকম ভাবে শুরু করেছো। আমাদের কোন কথা তুমি শোনো না, আমরা কখনোই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি না। এগুলো ভালো লক্ষণ নয়।

আর কথা গুলোর ফলে কোন শিশু বা টিনএইজার Lecturing and moralizion পছন্দ করে না। আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা কি পছন্দ করেছি। শিশুদের এধরনের কথাগুলো বলতে অনেক সময় হয় কি জানেন, আমরা তো তাদের সংশোধন করতে চেয়েছি। একটা তথ্য দিতে চেয়েছি এটা না, এটা করো। কিন্তু আমরা যে, এতো গুলো কথা শোনালাম ফলে বাচ্চারা সঠিক তথ্য গ্রহণ করতে পারে না।

৪. হুমকি (Threat):

আমরা কথা দিয়ে বাচ্চাদের হুমকি দিয়ে বলি, পড়াশোনা না করে রিক্সা চালাবে, রাস্তাঘাটে ঘুড়ে বেড়াবে। কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না । জীবনে আর বড় হবে না এই হুমকি (Threat) গুলো আমাদের শিশুদের সফলতার দিকে অগ্রসর করে না। এবং ইতিবাচক কোন পরির্বতনও আনে না। এছাড়াও আমরা আরো বিভিন্ন ধরণের হুমকি (Threat) দেই, তোকে কোনো জায়গায় নেবো না। ঘরে আটকিয়ে রেখে যাবো। এই ধরণের কথাবার্তা কখনোই শিশুদের গঠনে পজিটিভ প্যারেন্টিংর ভূমিকা রাখতে পারে না।

৫. আদেশ (Command) : গড়ে একজন পিতা-মাতা প্রতি মিনিট একটি আদেশ বা সংশোধন দেয়। পিতামাতারা অর্থ আমরাই প্রায়শই আদেশগুলি উচ্চারণ করি যেমন: শান্ত হও! দৌড়ানো বন্ধ কর, এই শাকপাতাটা খাও, এখন খেলতে যাবে না ইত্যাদি।

এই সমস্ত আদেশগুলি বাচ্চাদের কী করা উচিত তা জানিয়ে দিচ্ছে এককথায় তাদের স্বাধীনতায় বাঁধার তৈরি করছে। শিশুরা কি চায় সেটাকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং তাদের মঙ্গলকামনায় আমরা পিতা-মাতারা আমাদের আদেশ (Command) গুলো প্রয়োগ করি । ফলে একসময় দেখা যায় প্রচুর অকার্যকর আদেশ (Command) শুনে শিশুদের জন্য অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, তাই তারা তা মানার চেষ্টা বন্ধ করে দেয়। এখানে শিখতে স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যা পজিটিভ প্যারেন্টিং আত্মবিশ্বাসী রূপ দিতে পারে না।

৬.সতর্কীকরণ (Warning):

সতর্কীকরণ বিষয়টির মধ্যে অনুশাসন বিদ্যমান। অন্ধকারে দিকে গেলে আমরা বলি ভাউ আছে তাকে সতর্ক করতে গিয়ে। মিথ্যার আশ্রয় নিই। তার সাহস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা টেনে আনি। আমরা যখন আত্মীয় পরিজন বা বাজার করতে শিশুদের নিয়ে যেতাম তার আগেই আমরা সর্তক করে দিয়ে বলতাম ওই বাসার কিছু ধরবা না আনবা না, দোকানে গিয়ে না বলে কিছু ধরবে না। এই সর্তকমূলক বিষয়গুলো তে শিশু খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যায় তার যা পছন্দ সেটা তার নেই এবং সেটা চাইলে হয়তো পাওয়া সম্ভব না। তখন সে মনে মনে সর্তকরণীতে বুঝতে পারে তার চাহিদাতে ঘাটতি আছে। ফলে অতিসর্তকরণীতে শিশুর চিন্তার বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৭. তুলনা করা (Comparison):

যখন আমরা শিশুদের কিছু সংশোধন করতে চায় এবং ওদের কোন বিষয়ে পরিবর্তন আনতে চাই। আমরা তখন ভীষণ সহজ উপায়ে হিসাবে তুলনা করতে শুরু করি। আমরা ধরে নিই তুলনা করলেই তাদের আগ্রহ বাড়ে। তখন এই ধরনে কথা বলি তোমার বন্ধু বা তোমার ওই ভাইবোন কতভালো পড়াশোনা করে। কত ভালো রেজাল্ট করে। তোমার রেজাল্ট আর তার রেজাল্ট দেখো। এখানে বড় ধরনের বাঁধা। যখন একটি শিশুকে অন্যর সঙ্গে তুলনা করি তখন তার গিয়ে লাগে। আমরা যখন ছোট ছিলাম এমন কথা শুনে আমাদেরও কষ্ট লেগেছিলো। আমরা কিন্তু মেনে নিতে পারি-নি। আমাদেরও ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো। এই তুলনা (Comparison) আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি না করে বরং অদ্ভুত ধরণের রাগ, ক্ষোভ, জেদ এবং উল্টো মানুষটির প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলে। ফলে তুলনা করা একটি বড় ধরণের বাঁধা।

৮. কটূক্তি (Sarcosm) :

শিশুরা অন্যায় করলে মা বলে চোরের বংশ চোর হবি, বেইমানের ছেলে বেইমান হবে। ওর বাপের ধারা পেয়েছে। নানা ধরণের উদারণ দিয়ে থাকি শিশুদের ছোট ছোট দোষত্রুটি নিয়ে আমরা কটূক্তি মন্তব্য করি। যা শিশুকে বিচলিত করে তোলে। খুব তাড়াতাড়ি তার ভিতরে বিঁধে যায়। আমদের এধরনের কথাগুলো তাকে নেতিবাচক একটা চরিত্রকে পরিচয় করে দেয়। যে চরিত্র সে একদিন বড় হয়ে অন্যর বেলায় করতে পারে বা করবে।

৯. ভবিষ্যদ্বাণী (Prophecy):

"বারুদের গুলি আর মুখের কথা একবার মুখ হতে বেরুলে তো আর ফেরত আসে না"। শিশুদের চলাফেরা দেখে আমরা মন্তব্য করি। ওকে দিয়ে কিছুই হবে না। আর কি পড়াশোনা হবে! বড় হয়ে রিকশা চালাবে। আবার শিশুরা একটু মেধাবী হলে বলি ডাক্তার হবে। এভাবে ভবিষ্যদ্বানী করি। যা তাকে প্রেরণ নয় বরং ভিতরে ভেঙ্গে চুড়ে দেয়। শিশুদের জানার বয়সে তাকে আমরা বিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে ভবিষ্যদ্বানী করি। যা তাকে বিকশিত হতে বাঁধা দেয়।

ইতিবাচক প্যারেটিং দিক

ইতিবাচক পিতা-মাতা হচ্ছে এমন একটি কৌশল যা ইতিবাচক শাসনের ওপর আলোকপাত করে ।

১. আপনার শিশুকে স্নেহ ও ভালোবাসায় বেঁধে রাখুন:

শিশুরা কোমলমতি তারা সব সময় নিজেদের ছোট পরিসরে থেকে সব পেতে চায়। তাদের পিতা-মাতার স্নেহ ভালোবাসা প্রয়োজন বেশি। যার ফলে তাদের আত্মসম্মান বেড়ে যায়। শিশুরা নিরাপদ অনুভব করে তাদের আত্মবিশ্বাস বয়স্ক মানুষের মতো হয়ে ওঠে। যা তাদের স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২. আপনার বাচ্চার সাথে প্রায়ই কথা বলুন:

আপনার ভয়েস কেবল শান্তির উৎস নয়, কথা বলার মাধ্যমে আপনাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এবং ভবিষ্যতে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আরো উন্মুক্ত বোধ করবে।

৩. ভালো কাজের জন্য আপনার শিশুর জন্য প্রশংসা করুন: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালো কাজ ফুলের মতো। শিশুদের কে এই ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করুন তাহলে তাদের কর্মটির চালিকা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তারা সুন্দরে সঙ্গে থেকে সুন্দর কাজ করবে।

৪. আচরণ প্রদর্শন ও আচরণের উপর ফোকাস:

''ব্যবহারে বংশের পরিচয়'' কথাটি আমরা সবাই কম বেশি জানি। কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় বিভিন্ন পথে যাই। পিতা-মাতা যত বেশি ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করবে ততবেশিই শিশুরা শিখবে এবং ইতিবাচক স্বভাবের হবে। যখনই শিশুরা ৮-১২ চলে আসতে থাকে তারা বাহিরের গণ্ডিতে পরিচিতি হতে থাকে তখন তারা নতুন আচরণের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। সেটা ভালো মন্দ হতে পারে। তখন উচিৎ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সন্তাদের গ্রহণ করা। এবং তাদের আচরণের উপর একটু ফোকাস দাওয়া যেন তারা সঙ্গদোষে খারাপ না হয়।

৫. নতুন অভিজ্ঞতা উৎসাহিত করুন :

আপনার সন্তানকে নতুন জায়গায় নিয়ে যান এবং তাদেরকে নতুন কিছু করার চেষ্টা করুন। এতে আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শিখতে পারবে। শুধু তাদের এগিয়ে দিতে সমর্থন ও উৎসাহিত করুন।

৬. তাদের পছন্দ করতে অনুমতি দিন :

আপনার সন্তানের ছোট-ছোট পছন্দের সিদ্ধান্তগুলো সে নিতে চায় তাকে বাধা দেবেন না। আপনার পছন্দগুলি ছেড়ে বরং তার পছন্দগুলোতে সমর্থন করুন। তার সহজ এবং সেরা পছন্দটি তাকে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে। বরং সে কি খেতে পছন্দ করে, কি খেলতে পছন্দ করে বা কোন জামা পছন্দ করে

৭. তাদের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করুন :

এই পর্যায়ে আপনার সন্তানেরা সম্ভবত নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চায়। পিতা-মাতার উচিত তাদের সমাধানের পথটি সঠিক কিনা তা জানা খুব দ্রুত তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতা প্রদান না করে তাদের চিন্তা ও আস্থার উপর তাদের থাকতে সাহায্য করুন। যতসময় তারা সাহায্যের জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে ততসময় তাদের প্রতি ফোকাস রাখুন। যাতে করে তারা নিজেরাই চূড়ান্ত সমাধানের পদটি সঠিকভাবে নিতে পারে।

৮। সঠিক এবং ভুল এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা :

প্রায়ই, পিতা-মাতা ভেবে থাকে নিজের ছেলেমেয়েই সঠিক অন্যেরা ভুল। এই বিষয়টি এড়িয়ে চলুন। বরং খোলামেলাভাবে আলোচনা সঠিক কোনটি এবং ভুল কোনটি। যাতে সঠিক বিষয়টি জানে, ভুল বিষয়টিকে বর্জন করে।

৯. স্পষ্ট ও স্বচ্ছতার প্রতি গুরুত্ব দিন:

যা কিছু শিশুদের জন্য মঙ্গলময় এবং জীবনগঠনে গুরুত্বারোপ করে সেই ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলুন। কোনো প্রকার জ্ঞান বা উপদেশ নয়। স্বচ্ছতা হলো নলকূপের পানির মতো ''নলকূপের পানি যত গভীর হতে উঠবে তত বেশিই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। শিশুদের স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। স্বচ্ছতার সৌন্দর্যকে তুলে ধরুন।

১০। শিশুদের জীবনে মূল্যবোধের বীজ বপন করুন :

শিশুদের জীবন-গঠনে প্রধান বীজ হলো মূল্যবোধ। এই ছোট ক্ষুদ্র বীজটিই একদিন শিশুটিকে জীবন গঠনে সহায়তা করবে। ছোট মূল্যবোধ বৃক্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। যেমন: সততা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্য পরায়ন, শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধাবোধ

পরিশেষে

শিশুদের বেড়ে ওঠা এবং ভবিষ্যতে কাঠামোর সম্পূর্ণটাই নির্ভর করে বাবা-মায়ের প্যারেন্টিং স্টাইলের উপর। আজকে আপনি আপনার শিশুকে যতটা যত্ন এবং উষ্ণতা দিয়ে বড় করবেন ভবিষ্যতে সে ততটাই বিচক্ষণ এবং সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে।

মনে রাখবেন শিশুদের জন্য অতিরিক্ত কঠোরতা এবং অতিরিক্ত নমনীয়তা দুটোই ক্ষতিকর। তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য এই দুটি জিনিসের ভারসাম্য ঠিক রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের যথেষ্ট সময়, পরিমিত শাসন এবং পরিচর্যা দিয়ে গড়ে তুলুন। এতে তাদের মাঝ একটি সুন্দর ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে এবং আগামীতে একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে সমাদৃত হবে॥ ৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এডুয়ার্ড রবিন বল্লভ-এর সেশন থেকে,

সেন্টার ফর রুরাল সার্ভিস।

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি শীতল কস্তা, তলপুর ধর্মপল্লীর অধিবাসী। আমি দুই বছর যাবৎ কিডনিজনিত নানা রোগে ভুগছি। আমার পরিবার ও দুই সন্তান আছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি আমি। এ পর্যন্ত আমি আমার চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছি কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠতে পারি নি। আমার দুটি কিডনি নষ্ট, সপ্তাহে দুইবার ডায়ালাইসিস করতে হয়। যার ফলে খুব অর্থ কষ্টে আছি। বর্তমানে আমি মৃত্যুর পথযাত্রী। তাই প্রিয় খ্রিস্টভক্তগণ, আপনাদের সবার সহযোগীতায় হয়তো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবো। তাই আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আমার সুস্থতার জন্য সবাই প্রার্থনা ও চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগীতা করবেন। আপনাদের সহযোগীতায় হয়তো ঈশ্বর আমাকে আমার পরিবারের কাছে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আপনাদের সবার সহযোগীতা কামনায়-

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

Account Holder Name: Anu Costa
Shahjalal Islami Bank
Account No: 403712100006230
Phone No: 01752298849 (Bkash)

ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা
পাল-পুরোহিত, তলপুর ধর্মপল্লী
মোবাইল: ০১৭৮৬-৯১০১০৯

চলো মোরা মানুষ হই!

তার্সিসিউস পালমা

ফরিশীদের ভয়ে এক রাতে নিকোদিম যিশুর কাছে এসে জানতে চান স্বর্গ রাজ্যে যেতে হলে কি করতে হবে। যিশুর স্পষ্ট উত্তর-'আমাদের প্রত্যেককে আবার নতুনভাবে জন্ম নিতে হবে'। নিকোদিমের আবারো প্রশ্ন- মানুষ কিভাবে আবার মায়ের গর্ভে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিবে? যিশুর অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে এই নব-জীবনের পন্থা, নিজের মধ্যে পুনজনমের দিক্-নির্দেশনা তাঁর 'অষ্ট-কল্যাণ বাণী'তে ব্যাখ্যা করেছেন।

সমাজের বর্তমান বাস্তবতায় আমরা যদি নিজেদের কথার সাথে নিজেদের কাজ মিলাই, নিজের মিলনবাণীর সাথে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রগুলো তুলনা করি, তাহলে আমাদের সামনে কি এসে দাঁড়ায়! বিশেষ করে আমরা যারা সমাজে নিজেদের সমাজনেতা/পতি বলে দাবী করি, সমাজকে বিভিন্ন ছন্দের আড়ালে সত্য-সুন্দর বাক্যে বিমোহিত করে রাখি; যারা আমরা নিজেদেরকে উচ্চ শিক্ষিত দাবী করি, তাদের কাছে যিশুর এই 'নব-জন্মের' বাণী কি অর্থ নিয়ে আসে! আর এই মর্মার্থ লুকিয়ে আছে সমাজের একজন নিরক্ষর কুৎসিত চেহারার ব্যক্তি অথচ জগতখ্যাত বিখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষকদের শক্তিমান আদর্শ 'সক্রেটিস'-এর সহজ সরল উক্তি 'নিজেকে জানো' এর মধ্যে অন্তর্নিহিত।

আমরা নিজেদের খ্রিস্টান বলে দাবী করি, আমাদের সংগঠনগুলোতে খ্রিষ্টান শব্দে রাঙ্গিয়ে রাখি। অথচ আমাদের কাজ, আমাদের কথা এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনা যেন উল্টোরথে চলে। আমাদের সংগঠনিক ব্যানারে লেখা 'খ্রিস্টান' নামক স্মারকচিহ্ন, অথচ আমাদের আচার-আচরণ জাগতিকতায় ভরপুর। বিশেষ সময়ে আমরা জনগণের বুকে বুক মিলাই, কিন্তু ক্ষমতালাভের পর চেয়ারটাকে নিজের নিতম্বের সাথে গরুর গায়ের আঁঠাশের মতো লাগিয়ে রাখি। তাইতো যিশু আমাদের আঙ্গুল উঁচিয়ে বলেন, ভণ্ড তোমরা, বাহিরে তোমাদের ঝলকানি, অথচ তোমাদের অন্তরটা কদাচার-অনাচারে পরিপূর্ণ। খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের বলিদানের মূলমন্ত্র হলো অন্যের সাথে মিলিত হওয়া, অন্যকে নিজের মতো ভালোবাসা। কিন্তু বাস্তবতায় আমরা কি-ই-না চমৎকার অভিনয় করে চলেছি! মিলনভোজ থেকে বের হয়েই মেতে উঠি সামাজিক অনাচারের খেল-সাজিতে।

বাল্য-শিক্ষায় আমার পড়েছি- 'সদা সত্য কথা বলিবে'। অথচ দেখেন, কেউ যদি আমার বিষয়ে সত্য কথা বলে, তাকে আমরা কেউ পছন্দ করি না, বরং তাকে বর্তমান বিভিন্ন আইনের ফাঁদে ফেলে সেই ব্যক্তিকে আমরা নাস্তানাবুদ করে ছাড়ি। আসলে আমরা পছন্দ করি তোষামোদকে, চারিদিকে জয়-জয়কার চাটুকারদের। অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, বিভিন্ন সংগঠনে, প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন চার্চের অভ্যন্তরেও কখনো কখনো এদেরই কদর যেন বেশিই। ভালো মননশীলতার মানবতা সেখানে যেন মৃতপ্রায়।

আমাদের খ্রিস্টান সমাজ আজ বহুভাগে বিভক্ত। আর এই বিভক্তির মূলে রয়েছে মূলত তিনটি বিষয়। **প্রথমতঃ** আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি। আমরা শিখেছি- তেলওয়ালা বাঁশে বানরের উপরে উঠার অংক পদ্ধতি। তাইতো সমাজে চারিদিকে আজ তেলের এত বাহার! অন্যকে নিজের মতো ভালোবাসা মন্ত্রের বিপরীতে নেতাদের কাছ থেকে শিখেছি শত্রুকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে; এমনকি স্বার্থের মোহে নিজের কাছের বন্ধু, ভাই-ব্রাদারদের পদদলিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। প্রকাশ্যেই মিলন সমাজের পরিবর্তে শেখাই বিচ্ছেদের নামতা। **দ্বিতীয়তঃ** আমাদের মদ-মন্ত্র। মদ আমাদের তিলে-তিলে ধ্বংস করছে। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, সামাজিক সংগঠনের অনুষ্ঠান ও নির্বাচনে, সমাজ কবজায় প্রকাশ্যেই চলে মদের নেংটা হোলি-খেলা। আর সেখানে সবচেয়ে নিকৃষ্টভাবে বলির পাঠা হচ্ছে আমাদের যুব-সমাজ। আমরাই নিজেদের হাতেই জেনেশুনে ধ্বংস করছি ভবিষত প্রজন্মকে, তাদের সোনালী স্বপ্ন গড়ার পরিবর্তে বিকশিত করছি স্বার্থান্বেষী চেতনা। **তৃতীয়তঃ** আমাদের ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান হালচাল। ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিই আমাদের খ্রিস্টান সমাজকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছিল এবং করছে। কিন্তু কি নেক্কারজনকভাবেই না আমরা এই ক্রেডিট নেতৃত্বের নেশায় অন্ধ মোহে মেতেছি! এখানে কোন নীতিই যেন বাঁধ মানে না। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, শিক্ষার নীতি সব যেন বিবর্জিত আজ এই ক্রেডিটের ক্ষমতামোহে।

আমরা ভুলে যাই পবিত্র বাইবেলের সেই গরীব ভিক্ষুক লাজারের গল্পখানি। জীবিতকালে সেই ভিক্ষুক পাশের এক ধনীর দুয়ারে খাবার টেবিলের উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিজের উদর পূর্ণ করতো। মারা যাবার পর সেই লাজার স্বর্গে গিয়ে চিরকালীন সুখের রাজ্যে স্বয়ং আব্রাহামের কোলে গিয়ে স্থান পেল। আর সেই ধনী মারা যাবার পর গিয়ে পড়লো চিরকালীন অগ্নি-চিতার নরক রাজ্যে। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা, দেহ পুড়ে যাচ্ছে না বটে কিন্তু আগুনের প্রচণ্ড তাপদাহে তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায়! উপরে তাকিয়ে দেখে তার বাড়ীর সেই ভিক্ষুক স্বর্গে আব্রাহামের কোলে বসে মহানন্দে সুখ-সুধা পান করে চলেছে। সে আব্রাহামকে অনুরোধ করে যেন লাজার এসে তাকে আগুলের ডগায় করে পানির ফোঁটা দিয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করায়। আবার এও অনুরোধ করছে যেন- কাউকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তার বর্তমান পরিস্থিতি ও মন পরিবর্তনের বিষয়ে তার পরিবারের লোকজনদের যেন বলে আসে। আব্রাহামের উত্তর- 'স্বর্গে থেকে নরকে গিয়ে সাহায্য করার কোন পন্থা নেই, যে পৃথিবীতে সুখ-ভোগের সহভাগিতা করেনি তার জন্য মৃত্যুর পর কিছুই করার নেই। তাছাড়া, পৃথিবীতেই পরকালের অনন্ত সুখ অথবা দুঃখের জীবন বেছে নেবার সকল রাস্তাই বাতলে দেয়া আছে।'

এক বন্ধু এসে সেদিন বলল, কিসের সমাজকর্ম করো যদি সেখানে তোমার কোন উপ্‌রি ইনকামই না থাকে! আর তখনই মনে পড়ে গেলো আর একটি ঘটনা। আমাদের দেশের কোন এলাকার লোকেরা কোথাও কোন চাকরী করলে প্রথমেই নাকি জিজ্ঞাসা করে- সেখানে কোন উপ্‌রি পাওনা আছে কিনা, যদি কোন প্রতিষ্ঠানে সেই উপ্‌রি না-ই থাকে, সেটা নাকি কোন চাকুরীই না। আমার প্রশ্ন হলো এই উপরিটা আসলে আসবে কোথা থেকে? যখন আশে-পাশের বন্ধু-বান্ধব অনেকের দিকে তাকাই, তাদের চাকুরীর সাথে তাদের জীবন-যাত্রার চলন-

বলন মিলাতে পারি না। আমাদের চাকুরী, সমাজ-সেবার অর্থ তাহলে কি উপ্‌রি-র উপরই নির্ভলশীল!

ইদানিং আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; মোবাইল, ইন্টারনেটের জমানায় তা যেন ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে চলে যাচ্ছে। বাবা-মা, সন্তান সবাই যেন প্রচণ্ড আসক্তিতে মত্ত এখানে। ছোট বেলায় দেখতাম সন্ধ্যায় সকলে একত্রে বসে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা করতো, এতে করে প্রার্থনার পাশাপাশি সারাদিনের কাজ-কর্মের পর পরিবারের সবাই একত্রে বসে সবার খোঁজ-খবর নিতো, পরিবারের কোন বিষয় থাকলে সহভাগিতা করতো, ফলে সবার মধ্যে গড়ে উঠতো অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। আর এখন এটা যেন অনেকটা স্মৃতিপ্রায়। পরিবারে সবাই যার যার কর্ম-নিয়ে, মোবাইল নিয়ে, ফেইসবুক নিয়ে, নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। চারিদিকে 'আমরা' শব্দকে পাশ-কাটিয়ে 'আমিত্বের' বিস্ফোরণ ঘটছে। আর এই বিচ্ছুরনে ঘি ঢেলে আরো দ্বিগুণ করছি আমরা বাবা-মা'য়েরা, বড়রা, সমাজের নেতৃস্থানীয় আমরা। সবাই বলছি- সমাজ রসাতলে যাচ্ছে, যুব সমাজ নৈতিকতা হারাচ্ছে; আসলে এরা কারা? এরা কি আমাদের সন্তান নয়, এরা কি আমাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের ফসল নয়? তাহলে কাকে আমরা দোষারোপ করছি?

শিক্ষার অর্থ আলোা, শিক্ষা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা থেকে আলোর প্রতিবিম্ব সমাজকে ইতিবাচক হিসাবে প্রভাবিত করবে, অন্যকে অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষালাভের পর আমরা অনেকে বড় বড় চাকুরী করছি বা ব্যবসা করছি যা স্বাধীন কাজ করছি। কিন্তু যদি একটু নিজেদের দিকে তাকাই, যখন আমরা কোন সামাজিক প্রোগ্রামে বসি, কোন কাজে হাত দেই, ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তাহলে কি দেখতে পাবো? আমাদের এই শিক্ষিত সমাজের দৈনন্দিন কাজ, চিন্তা-চেতনা, সহভাগিতা এসব কি শিক্ষার সেই আলোকে প্রসারিত করে বা অন্যকে অনুপ্রাণিত করে, সমাজে কোন সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটায়? এটা বড়ই ভাববার বিষয়।

নতুন বছরে আসুন সবাই মিলে একটু উপলব্ধি করি- আমাদের নিজেদের, মূল্যায়ণ করি আমাদের ব্যক্তিগত সকল কাজ-কর্ম, আমাদের সকল অতীত ও চলমান চিন্তা-চেতনা। একে অপরকে দোষারোপ না করে আমাদের নিজেদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে নতুন-সমাজ গঠনে, প্রথমে নিজেদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সোনালী ভবিষ্যৎ প্রণয়নে সম্মিলিত কাজে হাত দেই। এই পৃথিবীকে একটি সত্যিকার শান্তি-সুখের ও মনুষ্যত্ববোধের সমাজ এবং সবুজ বনায়নযুক্ত একটি বাসযোগ্য আবাসস্থল হিসাবে গড়ে তুলি। চলুন বজ্রকণ্ঠে চারিদিকে আওয়াজ তুলি "চলো আবার মোরা মানুষ হই!"

ইতিহাসের জীবন্ত রূপরেখা: 'বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি'

সাগর কোড়াইয়া

ইতিহাস নাকি নিরস একটি বিষয়! তাই অনেকেই ইতিহাসকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে চান না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রূঢ়-বাস্তব সত্য ইতিহাস অধ্যয়ন করে ভালো চাকুরী পাওয়া দুঃসাধ্যই বটে। ইতিহাসে অনেকের আগ্রহ থাকলেও বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে সে আগ্রহে ভাটা পড়ে। তবু বলতে হয়- ইতিহাসের বাইরে আমরা কেউ নই। ইতিহাস সব সময়ই সত্য; ইতিহাসকে বিকৃত করা হলেও ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করা যায় না। ইতিহাস কথা বলে; আর সে কথা বলার মধ্যে ফুটে ওঠে পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বের অতীত কথা। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস মাত্র পাঁচশত বছরের অতীত। বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসের পদে-পদে বহু ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। মুখে-মুখে অনেক কিছু প্রচলিতও। তবে লিখিত আকারে না থাকলে তা এক সময় হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের ইতিহাসগুলো দলিলাকারে রাখা প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় ইতিহাসের বহু বই লেখা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণকে নিয়ে হয়েছে গবেষণা। আর অতীত গবেষণার ফলই ইতিহাসের বই। তবে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের ইতিহাস খুব কমই লেখা হয়েছে বোধ হয়। পত্রিকা, স্মরণিকা ও ম্যাগাজিনেই সীমাবদ্ধ ছিলো বেশি। যা লেখা হয়েছে সেগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের সূচনা ও বিস্তার সম্বন্ধে বই রচনা করেছেন। তার মধ্যে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত যেরোম ডি'কস্তার বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর নাড়ীনক্ষত্র সব কিছুই বইটির মধ্যে বিদ্যমান। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ডেনীস দিলীপ দত্তের বাংলা চার্চের ইতিহাস (সৃষ্টি থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে সমধিক গুরুত্ব বহন করে। বইটির মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এপার ও ওপার বাংলার খ্রিস্টমণ্ডলী মোটামুটি একই ধারায় ও একই পথে প্রবাহিত হয়েছে বিধায় দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত দুই বাংলার খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস মোটামুটি সমপর্যায়েরই বলা যায়। ওপার বাংলায়ও মণ্ডলীর ইতিহাসের উপর বই রচনা করা হয়েছে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রভু যীশুর গীর্জা হতে লুইস প্রভাত সরকারের বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় বইটি ইতিহাসের অজানা তথ্যকে সামনে তুলে ধরেছে।

যেরোম ডি'কস্তার বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী বইয়ের পরই সম্প্রতি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের সাথে আরেকটি ইতিহাসের বই যুক্ত হলো। ১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে ফাদার দিলীপ এস কস্তা রচিত বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি নামক বই প্রকাশ করা হয়েছে। প্রখ্যাত লেখক যেরোম ডি'কস্তার 'বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী' বইয়ের পরে ফাদার দিলীপ এস. কস্তার বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি বইটি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য যে ইতিহাসসমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল তা একবাক্যেই বলে দেওয়া যায়। বিক্ষিপ্তভাবে অনেকে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে নিয়ে লেখালেখি করেছেন বটে তবে ফাদার দিলীপ এস কস্তা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন আরো এক ধাপ। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে মণ্ডলীর ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে গবেষণা, সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ। আর এই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল ফলাকারেই প্রকাশিত হয়েছে ৩৫২ পৃষ্ঠা সংযুক্ত ইতিহাসধর্মী বইয়ের মাধ্যমে। বইটির বিষয়বস্তু আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও একে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে আনা দুঃসাধ্য কর্মই ছিলো বলা যায়। বইটির প্রথম অংশে ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা

হয়েছে। বইটিতে ৫টি অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশ আবিষ্কার, পর্তুগীজদের আগমন, অবদান, ভারতীয় উপমহাদেশে বাণীপ্রচার, বাংলাদেশ মণ্ডলীর সামগ্রিক পরিপক্কতা-অগ্রগতি অর্জন এবং দেশে ও দেশের বাইরে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর অবদান তথ্যবহুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বইটিতে এমন অনেক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে যা হয়তোবা কয়েক বছর বা দশক পরে হারিয়ে যেতো নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখন অন্তত হারিয়ে যাবার ভয় নেই। বইটিতে এমনভাবে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যেখানে আপনি, আমি ও আমরা কোন না কোনভাবে জড়িয়ে আছি। বইটির পৃষ্ঠার পরতে পরতে প্রাসঙ্গিক ছবি সংযুক্তকরণ বইটির সৌন্দর্যময়তাকে যেন আরো একধাপ তুলে ধরেছে। বইটি হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত ও আকর্ষণীয়। বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি বইটিতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জের্ভাস রোজারিও'র আশিস বাণী থেকে ধার নিয়ে বলা যায়, 'তার অনুসন্ধানী মন, কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণার ফসল হলো এই বই'।

ফাদার দিলীপ এস কস্তা নিজগুণে লেখালেখির জগতে একটি অনন্য স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। একে একে দেশ ও মণ্ডলীকে আটটি জ্ঞান-ধ্যান সমৃদ্ধ বই দিয়েছেন উপহার। প্রথম দিককার বই ও পরবর্তীতে প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। তবে প্রতিটি বইয়ের লেখা ও শব্দচয়ন লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয়কেই বহন করে। কবিতার গঠনপ্রণালী ও প্রবন্ধের শক্ত-সাবলীল মধুর ভাষাবুনন পাঠককে বরাবরই আকৃষ্ট করে। তবে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীর ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে ফাদার দিলীপ এস. কস্তার মধ্যে কোথায় যেন একটা অভাব এতদিন পরিলক্ষিত হয়েছে। এতদিন পর সে অভাব পূরণ হয়েছে বলা যায়। অবশেষে তিনি যে সত্যিই ইতিহাস অনুরাগী তারই প্রকাশ দেখতে পেলাম তার গবেষণাধর্মী ইতিহাসের জীবন্ত রূপরেখা বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি বইয়ের মধ্য দিয়ে।

সময়ের চাহিদানুযায়ী ফাদার দিলীপ এস. কস্তার বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি বইটি প্রকাশ করা সত্যিই প্রয়োজন ছিলো। সময়ের হিসাবে এ দেশে মণ্ডলীর ইতিহাস বেশী দীর্ঘ নয় ঠিকই; কিন্তু বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি এক মলাটে তুলে আনা কষ্টসাধ্য বিষয়ই ছিলো ফাদার দিলীপের জন্য। পাঁচশত বছরের বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি ফাদার দিলীপ এস কস্তা তার একদশকেরও বেশি একনিষ্ঠ গবেষণায় সাবলীলভাবে তুলে এনেছেন। বলা যায়- এই বইটি বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারের একটি সার্বিক চিত্র। বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচিতি বইটি পড়ে ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ফাদার দিলীপ এস কস্তার সৃষ্টিকে আমরা মূল্যায়ণ করতে পারবো। ইতিহাসধর্মী এই বইটি কতটা সফল তা বুঝতে অধ্যয়ন অপরিহার্য এবং আলোচনা সাপেক্ষ। নয়তোবা সৃষ্টি সৃষ্টির জায়গায়ই শুধুমাত্র স্থান দখল করে থাকবে- আমাদের নিজেদের বিষয়ে জানাই তখন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। হয়তোবা অনেকেই বইটির ইতিবাচক-নেতিবাচক সমালোচনা করবে- সেটা স্বাভাবিক; তবে আরো তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করলে পরবর্তীতে লেখকের জন্য সুবিধাই হবে। ফাদার দিলীপ এস কস্তা আমাদের হয়ে আমাদেরই কথা লিখেছেন- সাধুবাদ জানাই। ফাদার দিলীপকে বহু বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায় কিন্তু সব বিশেষণের ঊর্ধ্বে তিনি বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লায় একজন যিশু বাউল যাজক॥

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড
The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

(স্থাপিত: ১ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং-০৫, তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

ফোন: ০২-৫৮১৫৪৭৭১ মোবাইল: ০১৭৯৬-২৩২০১৬, ই-মেইল: caccoltd@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা **দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড**-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০টার সময় সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা (স্বাস্থ্যবিধি মেনে) অনুষ্ঠিত হবে**। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে (১) একজন ডেলিগেট (সমিতি কর্তৃক মনোনীত) অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল ডেলিগেটগণকে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তারিত সমিতির কার্যালয় থেকে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

নির্মল রোজারিও
চেয়ারম্যান, কাক্‌কো লি:

ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারী, কাক্‌কো লি:

পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও আমাদের সংস্কৃতি

স্বজন ইগ্নোশিউস ক্রুশ

সংস্কৃতি (Culture) হল একটি জাতির পরিচয়। ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠিকে উপস্থাপন করে সতন্ত্র করে তোলে। কৃষ্টি-সংস্কৃতি কেবল জাতির পরিচয় নয় বরং গৌরবের বিষয়ও বটে।

বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে চলছে; বদলাচ্ছে আমাদের জীবনও, বদলে যাচ্ছে মানুষের অভ্যাস, রুচি, চাওয়া-পাওয়া, ধ্যান-ধারনা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এ বিশ্ব আমাদের বেগ দিয়েছে, বদলে শুষে নিচ্ছে আবেগ। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের শেকড়। গাছের ডাল-পালার মতো আমরা ছড়িয়ে পড়ছি আর আধুনিক দুনিয়াকে জড়িয়ে ধরছি কিন্তু ভুলে যাচ্ছি মূলকে। আধুনিক হবার প্রতিযোগিতায় নিজ সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। ফলে আমাদের অবস্থা এখন মূল ছাড়া গাছের মতো, যে গাছ দাঁড়াতে পারে না।

আমাদের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান তবে তা সবই এখন বিলুপ্তর মুখে। জারিগান, সারিগান, কীর্তন, পালাগান, শাড়ি, লুঙ্গি, নকশি-কাঁথা, পিঠা-পুলি এ সবই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম কতটা জানে এ সম্পর্কে এ ব্যাপারটি মনে অনেক বড় প্রশ্নোবোধক ও আশ্চার্য্যবোধক চিহ্ন এঁকে দেয়। পপগান, রক-ব্যান্ড, আধুনিক পোষাক, আর ফাস্টফুড এখন আমাদের নতুন সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জায়গা দখল করেছে সব ইউরোপিয় বা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি। বাংলার জনপ্রিয় খেলা হা-ডু-ডু, নৌকাবাইচ, লাঠিখেলার সাথে আমরা কতটা পরিচিত আমার মতো বর্তমান প্রজন্ম এ খেলাধুলা সম্পর্কে জানে না বললেই চলে। ভিডিও গেমস দখল করেছে ঐতিহ্যবাহী এ খেলাগুলোর স্থান। যার ফলে নিজ সংস্কৃতিকে জানতে আমাদের যেতে হয় জাদুঘরে।

বর্ষবরণ, বিয়েসহ সকল অনুষ্ঠানে আমাদের নিজস্ব রীতি রেওয়াজ রয়েছে। তবে বর্তমানে আমরা এ অনুষ্ঠানগুলোকে আরো বৈচিত্র্যময় করতে ধার করছি অন্য সংস্কৃতি। এখন আমরা কোন রীতিতে উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি তা আমাদের নিজেদেরও জানা নেই।

তবে আধুনিক বিশ্বে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে লালন করতে পারি। আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোষাককে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। বাংলার লোক গান, লালন শাহ্, হাসন রাজা, আব্বাস উদ্দীন, আব্দুল করিমের গান বিশ্বমানের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ও শিল্প চর্চাকে প্রভাবিত করেছে। এগুলি আত্মর গান বা জীবনবোধ সঞ্চারী শিল্প। তবে সঠিক চর্চার অভাবে এখন তাও হারাতে বসেছি কিন্তু তার কদর এখনও কমেনি। যদিও লোকগানের আধুনিকায়ন হচ্ছে এবং দর্শক শ্রোতার কাছে ভালো লাগার স্থান করে নিয়েছে। ফলে আমাদের ঐতিহ্যকে লালন করতে ভূমিকা রাখছে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার অতি আধুনিকায়নে যেন লোকগানের ভাব-গাম্ভীর্য নষ্ট না হয়। সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যেন সংস্কৃতিকে নষ্ট না করে। বর্তমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতি বিশ্বের কাছে তুলে ধরার সুন্দর একটি মঞ্চ। কেবল আমাদের উদ্যোগ ও নিজ সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রয়োজন। পহেলা বৈশাখ ও আরো কিছু উৎসবে আমার যেভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করি, তা সবসময় চর্চা করতে হবে। আমরা যেন কেবল একদিনের বাঙালি না হই। বরং সবসময় নিজের বাঙারিয়ানাকে মনে ধারণ করতে পারি।

পৃথিবী বদলাচ্ছে। পরিবর্তনশীল এ বিশ্বের সাথে আমাদেরও হাঁটতে হবে সময়ের সাথে। বদলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে সে বদল যেন আমাদের স্বত্বাকে বদলে না দেয়। নিজের নিজস্বতাকে যেন নষ্ট না করে। সময়ের সাথে তাল মেলাতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পরবো আধুনিক বিশ্ব হতে। তাই সময়ের সাথে আমাদের চলতে হবে; চলতে হবে নিজ সংস্কৃতিকে সাথে নিয়ে। যেন এ সংস্কৃতির মৃত্যু না হয়। পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের সংস্কৃতিকে আঘাত করা বা নষ্ট করা মানে নিজেকে হারানো আর তা আত্মহননের সামিল। তাই রবি ঠাকুরের সেই কালজয়ী শুচিতার গান আমাদের সংস্কৃতিকে কলুষমুক্ত করার প্রয়াশ হয়ে উঠুক বারে বারে॥

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬, ১১৬/১ মণিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ [illegible] - ৯৪, ইমেইল: info@mcchsl.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৭ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রীঃ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী বিভিন্ন পদে উল্লেখিত সংখ্যক পদে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

আবেদনের নিয়মাবলী:

আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে ঃ

ক) আবেদনপত্র (A4 সাইজ কাগজে)
খ) দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির রেফারেন্সসহ জীবনবৃত্তান্ত।
গ) সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ (রঙিন) সত্যায়িত ছবি।
ঘ) সকল পরীক্ষা পাসের সনদপত্র (সত্যায়িত)।
ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
চ) সদ্য তোলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদের/পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ।
ছ) আবেদনকারীর বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
জ) M.S এপ্লিকেশন পরিচালনায় দক্ষ থাকতে হবে।
ঝ) যে পদের জন্য আবেদন করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে খামের উপর লিখতে হবে।

বর্ণিত পদসমূহ ঃ

ক্র.নং.	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন	আবেদনের যোগ্যতা
১	ব্র্যান্ড এবং মার্কেটিং ঃ			
	ক) ম্যানেজার	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	স্নাতকোত্তর বা সমমান মার্কেটিং বিভাগে, সংশ্লিষ্ট রিয়েল এস্টেটের কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবে।
	খ) এক্সিকিউটিভ	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	স্নাতকোত্তর মার্কেটিং বিভাগে এবং রিয়েল এস্টেটের কাজে কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	গ) গ্রাফিক্স ডিজাইনার	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। গ্রাফিক্স ডিজাইনিং কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২	আইটি			
	অফিসার	২টি	আলোচনা সাপেক্ষে	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক/স্নাতকোত্তর। ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩	প্রকৌশল			
	ক) বি.এস.সি. সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	বি.এস.সি. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আই.ই.বি রেজিস্ট্রেশনসহ ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি (MTO)	২টি	আলোচনা সাপেক্ষে	স্নাতক যেকোন বিষয়ে। (সোসাইটির মূল প্রকল্পে সদস্য পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে)
৪	প্রকিউরমেন্ট			
	অফিসার	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	সাপ্লাই চেইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫	ভূমি ঃ			
	ল্যান্ড অফিসার ([illegible])	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	ভূমি ক্রয়ের বিষয়ে কাগজপত্রাদি ও আইনগত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ভূমি সার্ভে সংক্রান্ত বিষয়ে, ভূমির দলিলপত্রাদি মিউটেশন/সীমানার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬	হিসাব বিভাগ			
	জুনিয়র অফিসার,	২টি	আলোচনা সাপেক্ষে	হিসাব বিভাগে স্নাতকোত্তর। ১/২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৭	মানবিক উন্নয়ন			
	জুনিয়র অফিসার	২টি	আলোচনা সাপেক্ষে	ব্যবস্থাপনায় স্নাতক/স্নাতকোত্তর
৮	জুনিয়র ডাটা এন্ট্রি	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	যে কোন বিষয়ে স্নাতক এবং কম্পিউটার এপ্লিকেশন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৯	স্টোর/রেকর্ড কিপার	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	যে কোন বিষয়ে স্নাতক, স্টোর ব্যবস্থাপনায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১০	এডমিন ম্যানেজার (লাইজন)	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	সরকারী অফিসসমূহে লাইজনের বিষয়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা (রাজউক, সিটি, [illegible]) থাকতে হবে। বয়স সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
১১	[illegible] কো-অর্ডিনেটর	১টি	আলোচনা সাপেক্ষে	যেকোন বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর। [illegible] অন্ততঃ ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। [illegible] এবং সরকারী [illegible] অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীর আবেদনপত্র সোসাইটির চেয়ারম্যান/ম্যানেজার এর বরাবর আগামী ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রীঃ তারিখের মধ্যে দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। (পূর্বে যারা CV জমা দিয়েছেন তাদেরকে উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী পুনরায় CV জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হল)

১) আবেদনপত্র বাছাই-বাছাই করে এর পর উপযুক্ত প্রার্থীদের নামের তালিকা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সোসাইটির নোটিশ বোর্ডে নির্ধারিত সময় জানানো হবে।

২) কোন প্রকার তদবির বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

[illegible]	[illegible]	[illegible]
চেয়ারম্যান, দি এম সি সি এইচ এস লি:	সেক্রেটারি, দি এম সি সি এইচ এস লি:	ম্যানেজার, দি এম সি সি এইচ এস লি:

প্রার্থনার ফল

এমি ত্রিপুরা

শস্য শ্যামল ছায়াঢাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা গ্রাম অচিনপুর। গ্রামের মাঝখানে জেরিনদের বাড়ি। জেরিনের বাবা মা খুব ভাল মানুষ। জেরিনকে তারা অনেক ভালবাসে। জেরিনরা মোট চার বোন। তার বড় বোনের নাম রেষ্ঠি এবং ছোট দুই বোনের নাম রিনি আর সেরিন বোনদের মধ্যে সেই বেশি শান্তশিষ্ট ও মৃদু স্বভাবের। জেরিন মা বাবার স্নেহ ভালবাসায় এবং খ্রিস্টীয় আদর্শে ধীরে-ধীরে বড় হতে থাকে। তাদের দিনকাল ভালই কাটে। বাবা মা পরিশ্রম করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চলে। জেরিন ছোট থেকে খুব প্রার্থনাশীল। একা একা নীরবে নিরালায় গিয়ে ধ্যান করত। কি ধ্যান করত? জেরিন নিজেই জানে না। ধীরে ধীরে জেরিন জ্ঞানে বয়সের দিক দিয়ে বেড়েই উঠতে লাগলো। ইতিমধ্যে তার বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায়। জেরিন জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে অনেক বড় কিছু করবে। তাই সে তার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে অনেক দূর পড়াশুনা করতে চায়। জেরিন দেখতে যেমন সুন্দরী ছিল তেমনি কথাবার্তা, আচার-আচরণও ভদ্র। ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলেরা তাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে। জেরিনদের বাড়িতে ছেলেদের উৎপাত বেড়ে গেছে, দুষ্ট ছেলেরা জেরিনকে রোজই বিরক্ত করে। প্রেমের অজুহাতে তাকে চিঠি পাঠায় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। এভাবে জেরিনের দিন যায়, রাত আসে, রাতের পর ভোর নামে। জেরিন কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। জেরিন দুষ্ট ছেলেদের অনেক ভয় পায়। এমনই দুঃখে ও লজ্জায় কাটতে লাগলো জেরিনের জীবন। কিন্তু এমনই অবস্থার মাঝেও প্রার্থনা করতে কখনো ভুলে যেত না। তাই সে নীরবে কাঁদত ও প্রার্থনা করত। যাতে দুষ্ট ছেলেগুলো মন পরিবর্তন করে। এদিকে তার বাবা-মাও চিন্তায় পড়ে গেল। একে ছাড়া তো ঘরে আরও দুইটা মেয়ে আছে। শেষে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে সিস্টারদের পরিচালিত হোস্টেলে চলে আসলো। জেরিন হোস্টেলে চলে আসতে পেরে খুব খুশি হল এবং মনে মনে বলতে লাগলো "হে ঈশ্বর তোমার দয়া দানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই"। জেরিন হোস্টেলে এসে সিস্টারদের আদর্শে, তাদের কথামত পড়াশুনা করতে লাগলো। জেরিন সময় নষ্ট না করে পড়াশুনায় মন দিল। অন্যেরা যখন দুষ্টামি করে সময় কাটায় তখন জেরিন একা বসে বই পড়তে থাকে। আর সিস্টারদের বাধ্য হয়ে চলত। জেরিন ছিল খুব সহজ সরল ও বাধ্য। হোস্টেলে সব দায়িত্ব কর্তব্য সে বিশ্বস্তভাবে ও সুন্দরভাবে পালন করত। এতে সিস্টাররা তাকে খুব আদর করে ও ভালবাসে। অন্যদিকে জেরিনের বাবা মা সবসময় উৎসাহ দিত যে আমরা অনেক পরিশ্রম করে তোমাদের পড়াচ্ছি এদিক সেদিক মন না দিয়ে পড়াশুনায় মন দিতে হবে। ভাল পাশ করতে হবে, কোন ক্লাশে যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। বাবা-মা'র এই বাণী মনে রেখে জেরিনও মন দিয়ে পড়াশুনা করতে থাকে। হোস্টেলে তার অতি বিশ্বস্ততা দেখে অনেকেই মুগ্ধ, অনেকেই আবার তার উপর হিংসা ও রাগ দেখাত। কিন্তু জেরিন কোন দিন কাউকে কষ্ট দেয়নি। নিজে কষ্ট পেলে নিরবে সহ্য করে। জেরিন এখন দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার বাবা মার আশা, সে ভাল রেজাল্ট করবে। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যেন তাদের মেয়ে সত্যিই ভাল করে এবং ভাল মেয়ে হয়। এদিকে জেরিনও গোপনে অনেক ত্যাগস্বীকার ও মানত করে, যাতে সে ভাল রেজাল্ট করতে পারে। তাই প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে। ঠিকই জেরিন, এসএসসি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করল। জেরিন মনে মনে খুশি হল এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে লাগলো, সে ঈশ্বরের সেবাকাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে। ভাল রেজাল্ট দেখে হোস্টেলে সিস্টাররাও অনেক খুশি, শুনে আরও খুশি হল যে, জেরিন ঈশ্বরের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করবে। জেরিন এখন বাড়িতে যায় খুব শান্তিতে থাকে, তাকে আর কেউ বিরক্ত করে না। সবাই জেরিনের সাথে ভাল ব্যবহার করে এমনকি দুষ্ট ছেলেরাও জেরিনের সাথে আগের মতো আচরণ করে না। এভাবে জেরিনের প্রার্থনার বিশ্বস্ততা ফল পেল।

একইভাবে আমরাও যেন প্রার্থনা করতে কখনো ভুলে। একবার প্রার্থনার ফল না পেলে করতে থাকি একদিন না হয় একদিন আমরা জেরিনের মতো প্রার্থনার ফল পাবই। আশীর্বাদ করুন জেরিনের জীবন যেন সুন্দর হয় এবং সে যেন সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে॥

যোনাথন গমেজ মাষ্টার
বাঁচা ইংলিশ মিডিয়াম

পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজের আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান-২০২০

নিজস্ব সংবাদদাতা ▌ গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ সমাজের দুই জন ভ্রাতা; ব্রাদার অর্পণ ব্লেইস পিউরিফিকেশন সিএসসি (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে) এবং ব্রাদার সৈকত সিপ্রিয়ান লিন্ডুয়ার সিএসসি-এর (দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ) আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। আজীবন সন্ন্যাস ব্রতকে কেন্দ্র করে তার আগের দিন ৩০ ডিসেম্বর, রোজ বুধবার আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য ধর্মপল্লীতে আরাধনা অনুষ্ঠান এবং সন্ধায় ব্রাদার অর্পণ ব্লেইজ পিউরীফিকেশন এর নিজ বাড়িতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সংস্কৃতি অনুসারে মঙ্গলানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পরের দিন ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে মহাখ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি। বিশপ তার উপদেশে আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকারী ব্রাদারদেরকে তার শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশপ মহোদয় বলেন, সন্ন্যাসব্রতী জীবনে তিনটি ব্রত আছে; কৌমার্য্য, দারিদ্রতা ও বাধ্যতা। এই তিনটি ব্রত আমরা এক দিনের জন্য গ্রহণ করি না বরং আজীবনের জন্য। একই সাথে তিনি জনগণকে আহ্বান করেন, তারা যেন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদেরকে সাহায্য করে। এদিন খ্রিস্টযাগে ২৫জন ফাদার, ৩৫জন ব্রাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টযাগের পরপরই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ব্রাদার সুবল রোজারিও সিএসসি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন এ অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও স্বার্থক করার জন্য॥

গোল্লা ধর্মপল্লীতে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা ▌ গত ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার বছরের প্রথম দিন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, গোল্লাতে ৯জন মেয়ে এবং ৪জন ছেলে মোট ১৩জনকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার তুষার জেমস গমেজ সাহায্য করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা এবং ফাদার ভিনসেন্ট বিমল গমেজ। বর্তমান করোনা বাস্তবতায় মানুষের জীবন, জীবিকা, অবস্থা, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করে নতুন বছরে মানুষের করণীয় ও খ্রিস্টীয় প্রত্যাশার বিভিন্ন দিকসমূহ ফাদার তাঁর সহভাগিতায় উল্লেখ করেন। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের উদ্দেশে সাধু আকুতিস এর উদাহরণ টেনে বলেন, সাধু আকুতিস খুব ছোটবেলা থেকে খ্রিস্টানুরাগী ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার বাধ্য ছিলেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা করতেন। তিনি পার্ক বা দর্শনীয় স্থান ঘুরতে যেতে আবদার করতেন না বরং পিতা-মাতাকে বলতেন বিভিন্ন গির্জা ও তীর্থস্থানগুলোতে নিয়ে যেতে। সাধু আকুতিসের মতো শিশুরা যেন খ্রিস্টের প্রতি আরো ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা বাড়িয়ে তোলেন সেজন্য তিনি তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। খ্রিস্টযাগের পর প্রার্থীদের সার্টিফিকেট, সাধু-সাধ্বীদের বই, রোজারি মালা ও টিফিন প্রদান করা হয়॥

এলএইচসি সংঘে প্রথম ব্রত অনুষ্ঠান

সিস্টার মিতু এলএইচসি ▌ গত ৮ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সাধু পিতরের ধর্মপল্লীতে মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের নবীস খুংবৈতি শিশিলিয়া ত্রিপুরা প্রথমবারের মত ব্রত গ্রহণ করে। সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন ১০জন ফাদার, ব্রাদারগণ, এলএইচসি সংঘের সিস্টারগণ, অক্সফোর্ড মিশনের সিস্টারগণ, অন্যান্য সংঘের সিস্টারগণ এবং সিস্টার খুংবৈতি শিশিলিয়া এর আত্মীয়-স্বজন ও ধর্মপল্লীর সীমিত খ্রিস্টভক্তগণ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ বলেন; 'আমরা পিতার সাথে নিরিবিলিতে অন্তরঙ্গ হতে চাই। তাই আমরা প্রতিজ্ঞার মধ্যদিয়ে ব্রত পালন করে মিলিত হই তাঁর সাথে। মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা অনুসারে আমরা যা করি তাই হলো ব্রত'। খ্রিস্টযাগের পরে নব ব্রতগ্রহণকারী সিস্টারকে কীর্তন সহকারে এলএইচসি মাদার হাউজে নিয়ে আসা হয়। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সংঘের প্রধান অধ্যক্ষা উপস্থিত সবাইকে এ ব্রত অনুষ্ঠান সার্থক ও সুন্দর করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর মধাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে শিশুদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার

ওয়েলকাম লম্বা ▌ গত ১ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, গোয়াইনঘাট, জাফলং, সিলেট ধর্মপ্রদেশে খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে শিশুদের নিয়ে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে ১৮০জন অংশগ্রহণ করে। সকাল ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে থাকে শোভাযাত্রা ও ধূপারতি। জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে খ্রিস্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করেন। তিনি তার উপদেশ বাণীতে বলেন-আমরা পুরাতনকে বিদায় দিয়েছি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আরও একটি নতুন বছর উপহার পেয়েছি তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই নববর্ষ আমাদের সবার কাছে নতুন আশা জাগায়। আমরা যেন পুরাতনকে ভুলে নতুন উদ্যম নিয়ে জীবন-যাপন করি। আমরা যেন পণ্ডিতদের মত আমাদের পথের পরিবর্তন করি। আমাদের মধ্যে যে মলিনতা রয়েছে, দুর্বলতা রয়েছে তা যেন বাদ দিতে পারি। খ্রিস্টযাগের পরে যোশুয়া খংস্লিং সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। সেই সাথে নতুন বছরে নতুন অঙ্গীকার নিয়ে জীবন-যাপন করার উৎসাহ দান করেন। তাছাড়া যুবক-যুবতীরা যেন ধর্মীয় কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তার জন্যে তাদের যুমন্ত মনটাকে জাগ্রত করেন। এর পরে থাকে জাফলং ধর্মপল্লীর যুবদের উদ্যোগে শিশুদের জন্য খেলা-ধূলা। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা বলেন- আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যেন শিশুদের যত্ন নিই। তাদের রক্ষনাবেক্ষণ করি। তাদের বেড়ে উঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করি। তিনি আবারও সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই খেলা-ধূলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ছোট থেকে বড় সবাই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সবাই অংশগ্রহণ ও দর্শক হিসেবে অনেক উপভোগ করে। খেলা-ধূলায় যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে সক্রিয়ভাবে সব কিছুতে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠান বিকাল ৪টায় সমাপ্ত হয়॥

খাগড়াছড়িতে বড়দিন উৎসব ও শুভ নববর্ষ ২০২১ পালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▌ ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন উৎসবের খ্রিস্টযাগ ২৪ ডিসেম্বর হতে শুরু করে ২৬ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের গির্জায় আনন্দ উৎসব, পবিত্র খ্রিস্টযাগ উপাসনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কেক কাটা, আতশবাজি ফুটানো ও মিলন ভোজের মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে।

উল্লেখ্য বড়দিন উৎসবে ত্রিপুরা পাড়ার বিচিতলা, আকবাড়ী ও মাটিরাঙ্গায় পালিত হল। অপর দিকে চাকমা পাড়ায় ইটছড়ি, কুলিপাড়া ও সাজেক পাড়াসহ মারমা পাড়া ভাইবোনছড়া এবং গাছবান ও তেতুলতলা ত্রিপুরা পাড়ায় বড়দিন অনুষ্ঠিত হয়।

আবার, বড়দিন উৎসবে নতুন ফসল ঘরে তোলার ভরা মৌসুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কারণে সুস্থির, স্বচ্ছন্দে ও আনন্দচিত্তে সকল জায়গায় পালিত হয়েছে। বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপনে পাহাড়ী খ্রিস্টভক্তদের পারিবারিক মিলনবন্ধন, শিশুদের কলতান, দর্শনীয় সাজ-সজ্জা ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।

তারপর পহেলা জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মারমা পাড়া ভাইবোনছড়ায় ঈশ্বর জননী মা মারীয়ার পর্ব পালন ও নতুন বছরের ক্যালেণ্ডার বিতরণ করা হয়। এদিন সকলে সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে খ্রিস্টীয় পরিবারের সকল পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়েরা একত্রিত হয়ে ভক্তি সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে এরা পবিত্রভাবে দিনটি পালন করেছে।

খাগড়াছড়িতে নববর্ষ পালন ও বর্ষবরণের মূল আনন্দ হল এক সাথে মিলেমিশে উপাসনায় অংশগ্রহণ। আর চটপটিকে পাহাড়ী এলাকায় বিরাণী বলে, সামাজিক আনন্দ সহভাগিতায় বিরাণী খেয়ে আনন্দ স্ফুর্তি করে ও একসাথে সবায় ভোজের আয়োজন করে॥

মহাপ্রয়াণের দ্বাদশ বছর

বারোটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী অবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছ আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, ঘরে ঘরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মন্জু রোজমেরী গমেজ
জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন - 'দাও প্রভু, দাও তাকে অনন্ত শান্তি'। আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সাবা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও বীরা গমেজ
জামাই ও ভাইঝি : সুবাস ও মিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাধিস্তা
নাতি ও নাতনী (ভাইঝির পক্ষে) : অভ্র, সাইনী ও শুভন
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

পরলোকে - স্বর্গধামে প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা
জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা (কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা) ময়মনসিংহ মিশনের হারবাইদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাত ১:১০ মিনিটে (২৭ ডিসেম্বর) কলকাতার টাংরা-এর "জাভেরেরো প্লেস" হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি যৌবনে ১৯ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সরকারী চাকরী করেন ও পরবর্তীতে ১৯ বছর মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে বড় কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তিনি একজন দক্ষ শ্রেণী প্রেস অপারেটর ছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছর চাকুরী জীবন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক। সব ছেলে-মেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া ও বিয়েশাদী দেওয়ার পর, সব দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বড় ছেলের পরিবারের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অত্যন্ত সুবক্তা, সদালাপী, ন্যায়, সৎ মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এক কর্মোদ্যম জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার মেজো পুত্র ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার PhD-র পাবলিক ডিফেন্স অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রোম যান। সে সময় তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে যান। তাছাড়া রোম, ভাটিকান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও বার্সেলিনা ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রার্থনায় তার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ২ ভাই, ২ বোন, বিধবা স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, ১১ জন নাতি-নাতনী ও ১ নাতবৌ। দেশ-বিদেশে তার রয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। তিনি প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তার বড় ভাই ও বর্তমান কলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার বাবা। ঈশ্বর তাকে চিরশান্তি দান করুন।

তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা যেভাবে দেশ-বিদেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তার আত্মার চিরশান্তির কামনায় যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও গ্রামবাসী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ও কৃতজ্ঞতায় —
স্ত্রী : আঙ্গুরী ডি'কস্তা

বড় ছেলে	: [illegible] ডি'কস্তা ও পরিবার (কলকাতা প্রবাসী)	মেজো ছেলে	: ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা [illegible]
বড় মেয়ে	: [illegible] ডি'কস্তা ও পরিবার ([illegible])	মেজো মেয়ে	: [illegible] ডি'কস্তা ও পরিবার ([illegible])
ছোট ছেলে	: [illegible] ডি'কস্তা ও পরিবার ([illegible])	ছোট মেয়ে	: [illegible] ডি'কস্তা ও পরিবার ([illegible])

প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তা
জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা
ও পরিবারবর্গ

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 02
Regd. No. DA-33
❖ 24 - 30 January, 2021, ১০ - ১৬ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

মৃত্যু তোমাকে নিয়েছে; আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে!
তোমাকে ছাড়া আমরা অসহায়; বেঁচে আছি তোমার স্মৃতি নিয়ে।

স্বর্গীয় ডেনিস পালমা

পিতা : স্বর্গীয় গ্যাব্রিয়েল পালমা (কালা)
মাতা : স্বর্গীয় মেগদেলিনা পালমা
জন্ম : ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

একটি বৎসর পূর্বে তুমি তোমার প্রিয়জনদের মায়া ত্যাগ করে হঠাৎ করেই পরলোকে যাত্রা করেছ। তোমার এ যাত্রার কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা আঁচ করতে পারিনি। তোমার এ অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়ার ঘটনায় সকলেই আমরা প্রচন্ডভাবে মুষড়ে পড়েছি। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি অসহায়। তবুও বিশ্বাস করি, সমস্ত কিছুর উপর যাঁর হাত রয়েছে, তিনি আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা স্বর্গীয় পিতাঈশ্বর। তিনি আমাদের সকলের জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধহস্ত। তাই তোমার মহাপ্রয়াণের প্রথম বার্ষিকীতে তোমার আত্মাকে রাখি মহান পিতার করকমলে। তিনি তোমাকে অনন্তধামে অনন্ত সুখে রাখুন এই প্রার্থনা করি।

জানি, স্বর্গ থেকে তুমি তোমার পরিবারকে ভুলে যাওনি। আমরা তোমার অসীম ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়েই বেঁচে আছি তোমার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে।

তোমারই ভালোবাসায় আপ্লুত ও স্নেহধন্য,

মমতা কৈলু (স্ত্রী)
বৃষ্টি প্রিজেট কনি পালমা (কন্যা)
সনি কেনেথ পালমা (বড় ছেলে)
মেরীয়ান জন্তা (বড় পুত্রবধূ)
ফিভেল কেভিন পালমা (নাতি)
বনি লিওনার্ড পালমা (ছোট ছেলে)
শবনম তেরেসা পিউরীফিকেশন (ছোট পুত্রবধূ)
লায়লা মেরী পালমা (নাতনি)
এবং সকল গুণগ্রাহী ও আত্মীয়বৃন্দ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
হ্যারল্ড রড্রিক্স ও খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org